আনন্দ প্রিয়

ঠিকানা ভারতবর্ষ

সমরেশ মজুমদার

এদিকে বৃষ্টি একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না। সন্ধে থেকেই টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতে অন্যদিন হয়তো ভাল লাগত, কাল লাগেনি। এই বৃষ্টি যদি কালও চলে তা হলে মুশকিল হয়ে যাবে। সকাল আটটার মধ্যেই কলকাতার বাস পৌঁছে যায় বারো কিলোমিটার দূরের হাইওয়েতে। আগে এই দূরত্ব রিকশায় চলে আসা যেত। দিন দশেক আগে পরপর দু'দিন দুটো রিকশাওয়ালা জঙ্গলে খুন হওয়ার পর রিকশাওয়ালারা এদিকে আসা বন্ধ করেছে। অটো চলে না প্যাসেঞ্জারের অভাবে। বাস আসে দু'বার। সকাল আটটায় হাইওয়েতে নেবে সেই বাস ধরতে হলে সূর্যকে দুটো অবধি বসে থাকতে হবে। সেটা সম্ভব নয়। অতএব এখানকার একমাত্র গাড়ির মালিককে খবর পাঠিয়েছিল দিশা, বারো প্লাস বারো যাওয়া-আসার জন্যে দক্ষিণা মাত্র একশো টাকা।

ভোর হল। বৃষ্টি চলছে। দিশার কোয়ার্টার্সের সামনে খোলা আকাশ, মাটি অনেকটা ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। ফলে আকাশটাকে অনেকখানি দেখা যায়। সেই আকাশ যে পরিষ্কার হবে তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবে জলের বেগ কমেছে।

দেখতে দেখতে তিনটে মাস চলে গেল। তিন মাস আগে সে যেদিন এই গঞ্জে এসেছিল সেদিন সূর্য সঙ্গে ছিল। জীবনের প্রথম চাকরিতে এখন একজন ডাক্তারকে অবশ্যই গ্রামে যেতে হয়। সেই গ্রামে থাকার ব্যবস্থা, খাবারের সুবিধে না থাকলেও তাকে যেতে হবে। দিশার ভাগ্যে অবশ্য একটা দেড়খানা ঘরের কোয়ার্টার জুটে গেল। মোটামুটি একটা থাকার মতো ব্যবস্থা করে সূর্য চলে গিয়েছিল পরের দিন। বলেছিল, যারা চাকরি করে তাদের অনেক বেশি স্বাধীনতা আছে। বছরে অনেকদিন আর্ন লিভ, ক্যাজুয়াল লিভ তাদের জন্যে সংরক্ষিত। এ ছাড়া পনেরো দিন শিশুসুলভ ছুটি তো আছেই। আর আমাদের ক্ষেত্রে ছুটি নেওয়া মানে আত্মহত্যা করা। সব পেশেন্ট ভেগে যাবে। বলবে এই ডাক্তারকে বিপদের সময় পাওয়া যায় না। রাত দুটোর সময় কোনও পেশেন্টের প্রয়োজনে ছুটে যেতে হবে, অষ্টমীর বিকেলেও তো পেশেন্টের শরীর খারাপ হতে পারে অতএব ডাক্তারের ছুটি নেওয়া চলবে না।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে মন ভাল হয়ে গেল দিশার। যাক, লোকটা তা হলে ভুলে যায়নি। জানলা দিয়ে হাত নেড়ে দাঁড়াতে বলে ছাতি নিয়ে বের হল দিশা। তখনই মনে হল আর একটা ছাতি থাকলে ভাল হত। কিন্তু একা কোনও মানুষের কাছে দুটো ছাতা থাকে?

ছাতি খুলে দৌড়ে গাড়িতে উঠতে গিয়েও একটু ভিজে গেল দিশা। উঠে দরজা বন্ধ করে বলল, 'বাব্বা! কী বৃষ্টি।'

'অন্য কেউ হলে আজ গাড়ি বের করতাম না দিদি।' ড্রাইভার বলল।

'কেন?'

'চলুন, দেখবেন।'

ঢালু জায়গাটা পেরিয়ে আসামাত্র বোঝা গেল রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তারপরেই মাটির রাস্তায় গাড়ির চাকা পিছলে যেতে লাগল।

দিশা ভয় পেল, 'যাওয়া যাবে তো?'

'এটা কিন্তু না। ভূত পুল পার হতে মুশকিল হবে।'

দিশা চুপ করে গেল। কাদা-রাস্তা বৃষ্টিতে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। গাড়িটাকে এখন নৌকো বলে মনে হচ্ছে। আর কিছুটা গেলেই ভূত পুল। লোকে বলে ওখানে নাকি অন্ধকার আর ঝড়-বাদলের রাতে ভূত দেখা যায়। অবশ্য তেমন কাউকে সে এই তিন মাসে পায়নি যে নিজের চোখে ভূত দেখেছে। ড্রাইভার বলল, 'আপনি মোষের গাড়ি ভাড়া করলে ভাল করতেন।'

'মোষের গাড়ি?' দিশা অবাক।

'হ্যাঁ। এই কাদা ওদের কাছে কিছু না। সাবধানে বসুন।'

দিশা দেখল ভূত পুল এসে গিয়েছে। ড্রাইভার অ্যাকসিলেটারে চাপ দিতেই গাড়ি গোঁ গোঁ আওয়াজ করে ওপরে উঠতে গিয়েও আটকে গেল। পেছনের চাকা কাদায় ফেঁসে গেছে, মিনিট তিনেক চেষ্টা করে ড্রাইভার বৃষ্টির মধ্যেই নীচে নেমে গেল।

মিনিট দশেক বাদে গাড়ি উঠে এল ভূত পুলে। দিশা দেখল পুলের নীচে নদী বইছে। সাধারণত এখানে জল থাকে না। এখন সেটা ভাবতেই পারা যাবে না।

হাইওয়ের পাশে বাসস্টপে পৌঁছোতে প্রায় আটটা বেজে গেল। ড্রাইভার ওকে ভরসা দিয়ে যাচ্ছিল, 'আপনি কোনও চিন্তা করবেন না দিদি। কলকাতা থেকে যে বাস আসছে সেটা কখনই এই বৃষ্টিতে ঠিক টাইমে আসতে পারবে না।'

পানের দোকানটা আধা ভেজানো। চা-শিঙাড়ার দোকানের ঝাঁপও অর্ধেক ফেলা। চৌমাথায় আর কোনও লোক নেই। ড্রাইভার বলল, 'বাইরে দাঁড়িয়ে লাভ

নেই, ভিজে যাবেন, গাড়িতেই বসে থাকুন।'

বৃষ্টি বাড়ছে। চারপাশ সাদা হয়ে গেছে। দিশা ভাবছিল সূর্যের কথা। সেই কাল সন্ধের মুখে কলকাতার বাসে উঠেছে। সারারাত জেগেছে বেচারা। বৃষ্টির জন্যে হয়তো গরম একটু কম লেগেছে। এই তিন মাসে তিনবার আসছে সূর্য। বলেছে, তুমি চাকরি ছেড়ে দাও।

চাকরি ছেড়ে দাও কথার কথা। ওর মতো কপাল তো সবার হয় না। পাশটাস করে পাড়ার সুবোধ মেডিক্যালে দু'ঘণ্টার জন্যে বসার জায়গা পেল। বাইরে বোর্ড টাঙাল পয়সা খরচ করে ডক্টর সূর্য দত্ত, এম বি বি এস (দশটা থেকে বারোটা)। প্রথম দিনেই ঘটনাটা ঘটল। এগারোটা পর্যন্ত চুপচাপ ছোট ঘরে বসে ছিল সূর্য। ওপাশের কাউন্টারে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে। কেউ এসে জানতে চাইল, তিন বার পায়খানা হয়েছে কী খাব অথবা পেটে ব্যথা হচ্ছে কী খাওয়া উচিত, অমনি সেলসম্যান বলে দিচ্ছে, যান না, ভেতরে ডাক্তারবাবু আছেন, দেখিয়ে ওষুধ নিন।

'আহা, এমন কিছু নয়, আপনিই বলে দিন না।'

সূর্য লক্ষ করছিল এখন মানুষ অনেক ওষুধের নাম জানে। ছোটখাটো ব্যাপারে নিজের চিকিৎসা এখন নিজেরাই করে। একটু আগে একজন একটা প্রেসক্রিপশন দিল। অ্যান্টিবায়োটিক এবং ভিটামিন, সঙ্গে অ্যান্টাসিড। সেলসম্যান বলল, 'একী! এ তো দু'বছর আগের প্রেসক্রিপশন।'

পেশেন্ট বলল, 'তাতে কী! রোগ তো একই। আমি মশাই আমার ফ্যামিলির কেউ ডাক্তার দেখালে প্রেসক্রিপশন রেখে দিই। কী রোগে কী ওষুধ দিল পেছনে নোট রাখি। সেগুলো ঘুরে ফিরে হলে আর ডাক্তারের কাছে নতুন প্রেসক্রিপশনের জন্যে যেতে হয় না।'

ভেতরের ঘরে শুনে চমকে গেল সূর্য। সবাই যদি এই রাস্তায় হাঁটে তা হলে ডাক্তারি করে খেতে হবে না। এদিক দিয়ে হোমিওপ্যাথরা বেশ বুদ্ধিমান। প্রেসক্রিপশন দেয় না। ওষুধ কম্পাউন্ডারকে দিয়ে বানিয়ে পেশেন্টকে দেয়। কী ওষুধ দিল তা জানার কোনও চান্স নেই।

এগারোটা নাগাদ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এলেন, 'কোনও ডাক্তার আছে?'

'আছেন।' সেলসম্যান বলল, 'ভেতরে যান।'

প্রৌঢ় ভেতরে ঢুকে সূর্যকে দেখে খুব হতাশ হলেন, 'ও।'

'হ্যাঁ, বলুন।' সূর্য সোজা হয়ে বসেছিল।

'না মানে, আচ্ছা, আমার নাতি খুব অসুস্থ। মানে একশো চার জ্বর। হাত-পা

ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ওকে কি হাসপাতালে নিয়ে যাব?'

'পেশেন্ট না দেখে তো বলতে পারব না।'

'বাড়ির সবাই বলছে তড়কা হয়েছে, তড়কা কি ডেঞ্জারাস!'

উঠে দাঁড়াল সূর্য, 'চলুন।'

ভদ্রলোক নিতান্ত অনিচ্ছায় সূর্যকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনাকে তো এ পাড়ায় আমি দেখেছি! আমি ভাবিনি আপনি ডাক্তার।'

'ও।' সূর্য কিছু বলতে পারেনি।

বাড়িতে ঢুকে পেশেন্টকে দেখে সূর্য অবাক। এই গরমে ওর সারা শরীরে লেপ চাপানো। এক ভদ্রমহিলা মাথা ধুয়ে দিচ্ছেন। সূর্য নাড়ি দেখল। তারপর স্টেথো খুলতেই ভদ্রলোক বললেন, 'না, মানে, আপনি বলে দিন হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে কিনা!'

সূর্য বুঝল, হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি চান না আমি চিকিৎসা করি?'

'না, মানে—।' ভদ্রলোক কথা শেষ করতে পারলেন না।

সূর্য মরিয়া হল। সে ভদ্রমহিলাকে বলল, 'দয়া করে ওর শরীর থেকে লেপ সরিয়ে দিন।'

'ওর যে জ্বর হয়েছে।'

'আমি যা বলছি তাই করুন। আপনি জলে ভিজিয়ে মাথা ঠান্ডা করতে চাইছেন আবার একই সঙ্গে শরীরে লেপ চাপা দিয়ে গরম করছেন। খুলে দিন।'

শেষের দুটো শব্দে ধমক ছিল। ভদ্রমহিলা দ্রুত লেপ সরালেন। দেখা গেল, মোটা কাপড়ের শার্ট পরে আছে বাচ্চাটা। সেটাকেও খোলাল সূর্য। তারপর বলল, 'জানলাগুলো বন্ধ রেখেছেন কেন? ওগুলোও খুলে দিন।' প্রৌঢ় এগোলেন।

একটা বড় অয়েলক্লথ চেয়ে নিয়ে বাচ্চাটাকে ওর ওপর শুইয়ে দিয়ে এক বালতি জল আর তোয়ালে চাইল। সেগুলো হাতে পাওয়ার আগে বাচ্চাটার বুক-পিঠ স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করে নিয়ে বুঝল অবস্থা খুব সুবিধের নয়। তারপর সমস্ত শরীর ভেজা তোয়ালে দিয়ে স্পঞ্জ করিয়ে দিতে লাগল সে। মিনিট দশেক যাওয়ার পর বাচ্চাটা চোখ খুলল।

সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'কী! ভাল লাগছে?'

বাচ্চাটা দুর্বল চোখে তাকাল। তারপর চোখ বন্ধ করে দিল।

সূর্য ভদ্রমহিলাকে বলল, 'এক ঘণ্টা পরে আবার এইভাবে স্পঞ্জ করবেন।

আর এই ওষুধগুলো এখনই আনিয়ে খাইয়ে দিন।'

প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে সে ভদ্রমহিলাকে মন্তব্য করতে শুনল, 'গায়ের গরম এখন অনেক কমে গিয়েছে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় সে আর একবার ভদ্রমহিলাকে বলল, 'স্পঞ্জ করবার আগে মাথাটা ধুয়ে দেবেন। কোনও ভয় নেই।'

প্রৌঢ় কিন্তু কিন্তু করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দিতে হবে?'

'আপনি তো চাননি আমি চিকিৎসা করি তা হলে কেন দেবেন?'

সেদিন দোকান থেকে বেরুবার আগে সেলসম্যান তাকে বলেছিল প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে ওষুধ নেওয়ার সময় প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করেছেন, 'এই ডাক্তারের পসার কেমন?'

'আপনি কী জবাব দিলেন?'

'সবে শুরু কিন্তু জমে যাবে।'

সেদিন বিকেলে প্রৌঢ় ভদ্রলোক সূর্যর বাড়িতে এসে হাজির। সূর্যর বাবাকে দেখে চিনতে পেরেছেন। বললেন, 'আপনার ছেলে যে ডাক্তার তা আমি জানিই না। উনি আছেন?'

সূর্য বাড়িতে ছিল। বেরিয়ে এল।

ভদ্রলোক হাত ধরলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ বাবা। তখন না জানা থাকায়—বুঝলে নাতি এখন বেশ ভাল। দুপুরের পর জ্বর আসেনি। উঠে বসেছে। টোস্ট দিয়েছিল বউমা, খেয়েছে। তুমি তো দারুণ ডাক্তার।'

'আর কিছু বলবেন?' সূর্যর এবার রাগ হচ্ছিল।

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী বললেন পথ্য কী খাবে জেনে এসো। আমি সুবোধে গিয়ে তোমার ঠিকানা চেয়ে নিয়ে এখানে এলাম।'

'যা স্বাভাবিক তাই দেবেন। ঝাল-মশলা একদম নয়। আর ওষুধের কোর্সটা যেন ভাল হয়ে গেছে বলে বন্ধ করে দেবেন না।'

'ঠিক আছে। এটা রাখো।'

'কী এটা?'

'তোমার সম্মান দক্ষিণা। আমার স্ত্রী পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

সূর্য পঞ্চাশ টাকার নোটটার দিকে তাকাল। তারপর হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে পকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'নমস্কার।'

ঘটনাটা প্রচারিত হতে বেশি দেরি হয়নি। একটা একটা করে পেশেন্ট আসতে লাগল সূর্যর চেম্বারে। ফলে সকাল বিকেল বসতে হল সুবোধ মেডিক্যালে। এসব

ঘটনা যখন ঘটেছিল তখনও ওদের বিয়ে হয়নি। একটা নার্সিংহোমে খুব অল্প টাকায় ঢুকেছে দিশা। মাঝেমাঝেই বিকেলে হয় নন্দন নয় আকাদেমিতে দেখা হত দু'জনের। সূর্য পরামর্শ দিত প্র্যাকটিস করতে। এখনও বাঙালি মেয়েরা তাদের নিজস্ব শারীরিক সমস্যায় ছেলে ডাক্তারের থেকে মেয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে পছন্দ করে। প্র্যাকটিস শুরু করলেই জমে যাবে। নিজস্ব চেম্বারের দরকার নেই, পাড়ার ওষুধের দোকানে গিয়ে বসো। কথাটা শুনেছিল দিশা। দোকানের শর্ত ছিল তিরিশ টাকা রোগী প্রতি, এর ভাগাভাগি হবে আধাআধি। এক মাসে আটজন পেশেন্ট এসেছিল এবং তাদের কেউ দ্বিতীয়বার আসেনি যখন শুনেছে ডাক্তারদিদি সদ্য পাশ করেছে। দোকানদার বলেছিলেন, 'দিদি এভাবে হবে না। হাসপাতালে চাকরি নিন। শ'দেড়েক পেশেন্টকে মরতে দেখুন, তবে তো অভিজ্ঞতা হবে।'

বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। গাড়ি থেকে নামল দিশা।

'আরে! আপনি এখানে? কী খবর?' গলা তুলে তাকাল সে। কৃষ্ণকান্তবাবু। এখানকার পোস্টমাস্টারমশাই। ছাতি হাতে আসছেন। অন্য হাতে বাজারের থলে।

'ভাল আছেন?' দিশা হাসল।

'নাঃ। স্ত্রী যদি অসুস্থ হয় তা হলে কোন পুরুষ ভাল থাকে?'

'কী হয়েছে আপনার স্ত্রীর?'

'কী হয়নি? ফিরিস্তি দিতে গেলে মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। তা বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, একজনকে রিসিভ করতে এসেছি।'

'ও। কলকাতার বাসে আসবে বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমার স্বামী আসছেন।'

'ওহো। হ্যাঁ শুনেছিলাম বটে আপনার স্বামী মাঝে মাঝে আসেন। এসেই কর্পূরের মতো মিলিয়ে যান। সত্যি, কী জীবন হল? অল্প বয়স, বিয়ে হয়েছে অথচ দু'জন থাকেন দুই পৃথিবীতে। ঠিক আছে, এবার কিন্তু আলাপ করতে যাব।' বলে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েও পিছিয়ে এল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? আপনার কাছে ওরা যায়নি তো?'

'কারা?'

'ও, তা হলে যায়নি। আচ্ছা! চলি।'

আটটার বাসটা এল সাড়ে ন'টায়। কয়েকজন প্যাসেঞ্জার নামল বাস থেকে। এই বাস কলকাতার এসপ্লানেড থেকে ছেড়েছে। কী রকম নিজের বলে মনে হল। কিন্তু সূর্য নামছে না কেন? তার মানে সূর্য আসেনি? বুকের ভেতরটা কী রকম মুচড়ে উঠল দিশার। নিশ্চয়ই একেবারে শেষ মুহূর্তে আসা বাতিল করেছে। ড্রাইভার পাশে এসে দাঁড়াল, 'আসেননি!'

'বুঝতেই পারছি না।'

'এলে নেমে আসতেন। আপনি ফালতু কষ্ট করলেন।'

আচ্ছা, এমন তো হতে পারে সূর্য না আসতে পেরে কন্ডাক্টরের হাতে চিঠি দিয়েছে। ও তো জানেই দিশা বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করবে। দিশা কন্ডাক্টরের দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা তখন সিগারেটে টান মারছে।

'আচ্ছা, কলকাতা থেকে সব সিট ফুল হয়ে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'একজনের এই বাসে আসার কথা ছিল, আপনাকে কেউ কোনও খবর দিতে বলেছে? আসেনি বলে জিজ্ঞাসা করলাম।' দিশার নিজেরই খারাপ লাগছিল।

'না তো। কেউ কিছু বলেনি। আচ্ছা, আপনি একবার বাসে উঠে দেখুন তো!'

'আমি বাসে উঠে দেখব?'

'এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে ঘুমাচ্ছেন। আমি ডিস্টার্ব করিনি।'

এ আবার কী রকম কথা! তবু দরজা খুলে বাসে উঠল দিশা। উঠেই হতভম্ব হল। সামনের দিকের জানলার ধারের সিটে বসে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে ঘুমে কাদা হয়ে আছে সূর্য। দিশা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসা যাত্রীকে বলল, 'ওকে একটু ডেকে দেবেন, প্লিজ।'

লোকটি এই যে মশাই, এই যে মশাই করতে কোনওক্রমে চোখ মেলল সূর্য। যেন তাকাতে পারছে না। জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

দিশা একটু ঝুঁকে বলল, 'তোমার গন্তব্যস্থল এসে গিয়েছে। না নামলে অনেকটা রাস্তা টেনে নিয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সূর্য, 'কী আশ্চর্য? তুমি?'

'তোমার ঘুম ভাঙাতে।'

তাড়াতাড়ি ব্যাগটা নিয়ে নেমে এল সূর্য। পেছনে দিশা। কন্ডাক্টর বলল, 'যাক পেয়ে গেছেন।'

হাঁটতে হাঁটতে দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তায় ঘুমাওনি?'

আমারবই.কম

'প্রথম রাত্রে হয়নি। আসলে গত একমাস ধরে চব্বিশঘণ্টায় চার ঘণ্টার বেশি ঘুমাবার সুযোগ পাচ্ছি না। বেশ বৃষ্টি হচ্ছে এখানে, না?'

'খুব। কলকাতায়?'

'ভ্যাপসা গরম।'

'রিকশা নেই, এই গাড়িতে ওঠো।'

'বাঃ। চমৎকার।' ওরা গাড়িতে উঠলে ড্রাইভার সিটে বসল, 'এখন?'

'বাড়ি ফিরে যাব।' দিশা বলল।

জানলার কাচ নামাতে গিয়ে থেমে গেল সূর্য, 'যাচ্চলে, আবার বৃষ্টি নামল।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল দিশার, 'এই, তুমি যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'কেন দেখলে? আমাদের একসঙ্গে দেখার কথা ছিল না?'

'তুমি গেলে আবার দেখা যাবে।'

'ছাই দেখবে তুমি।'

'মা জিজ্ঞাসা করছিল তুমি কবে যাবে?'

'কোন মা?'

'আরে আমার মা। তোমার মা হলে তো শাশুড়িমা বলতাম।'

'আচ্ছা, আমি যদি তোমার মাকে, এই যে শাশুড়িমা বলে ডাকি তা হলে কী রকম প্রতিক্রিয়া হবে?' দিশা বলল।

'দিশাহারা।' সূর্য জবাব দিল।

'তার মানে?'

'তোমাকে হারাতেন তিনি। বলতেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।'

'সত্যি? অদ্ভুত।'

বৃষ্টিতে গাড়ি স্পিড রেখেছিল ততক্ষণই যতক্ষণ রাস্তাটা কাঁচা হয়নি। দিশা বলল, 'রাস্তা খুব খারাপ। কাদায় ভরতি হয়ে আছে।'

প্রায় মিনিট পাঁচেকের চেষ্টায় ভূত পুলে উঠল গাড়িটা। নীচে নদীর জল আরও বেড়েছে। সেটা লক্ষ করে সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে বন্যা হবে নাকি!'

ড্রাইভার হেসে উঠল, 'জমি এত ঢালু যে বেশিক্ষণ জল দাঁড়িয়ে থাকে না।'

ভূত পুল থেকে নামতে গিয়ে গাড়ির চাকা স্লিপ করল। একেবারে রাস্তার বাঁ দিকে ছিটকে যাচ্ছিল, ড্রাইভার কোনও মতে সামাল দিল। সূর্য ঢলে পড়তে পড়তে দিশাকে আঁকড়ে ধরে বলল, 'বাপরে বাপ। কী রাস্তা!'

দিশা ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'যেতে পারবেন তো ভাই?'

'এই রাস্তা দিয়েই তো এসেছিলাম, ভগবানকে ডাকুন, তিনি পৌঁছে দেবেন।'

সূর্য দিশার দিকে তাকাল, 'কোন ভগবানকে ডাকবে?'

'চুপ করো তো।'

নৌকোর মতো পিছল রাস্তা পেরিয়ে কোনওমতে গাড়িটা যখন পৌঁছোল তখন ওটাকে চেনা যাচ্ছে না। সর্বাঙ্গে কাদা মাখামাখি। ড্রাইভার বলল, 'এটাকে পরিষ্কার করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে আমার।'

'করবেন না। আবার তো ওই রাস্তা দিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে।' সূর্য বলল। বৃষ্টি এখন পড়ছে না। কিন্তু আকাশের মুখ আবার অন্ধকার হচ্ছে।

'আপনি কবে যাবেন স্যার?' ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল।

'কাল বিকেলের বাস ধরব।'

'তা হলে আমাকে পাবেন না।'

'কেন?'

'বুকিং আছে। কাল দুপুরেই বেরিয়ে যেতে হবে।'

'চমৎকার! বিকল্প ব্যবস্থা কী? ওই কাদা তো সাঁতরাতে পারব না।'

'একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। ওঃ, এসেই যাওয়ার জন্যে চিন্তা করছ। এই নিন ভাই।' টাকাটা দিয়ে কোয়ার্টার্সের দিকে এগোল দিশা।

ঠিক তখনই এক বৃদ্ধ চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। বৃদ্ধ যে ডাক্তারদিদি বলে তাকেই ডাকছে বুঝতে একটু সময় লাগল।

দিশা ঘুরে দাঁড়াতেই সামনে পৌঁছে গেল বৃদ্ধ, 'ডাক্তারদিদি, আমার মেয়েটাকে আপনি বাঁচান, এখনই একবার চলুন হাসপাতালে।'

'আপনার মেয়ের কী হয়েছে?'

'বাচ্চা হবে। খুব কষ্ট পাচ্ছে। আয়া বলল আপনাকে খবর দিতে।' বৃদ্ধ বলল।

দিশা অসহায়ের মতো তাকাল সূর্যর দিকে। সূর্য আসবে বলে এই দিনটার জন্যে সে একমাস ধরে অপেক্ষা করে আছে। এই মেঘ-বৃষ্টি, যাতায়াতের পক্ষে যতই বিরক্তিকর হোক না কেন, ঘরে বসে থেকে উপভোগ করার মজাই আলাদা। কিন্তু—। সূর্য বলল, 'কিছু করার নেই। এখানে তুমি ডাক্তার। আমার স্বামী এসেছে বলে আমি চিকিৎসা করতে পারব না এ কথা বলতে পারো না।'

কাজের মেয়েটা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখিয়ে সূর্যকে দিশা বলল, 'তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও, ও চা করতে করতে আমি ফিরে আসব।'

'ওকে!' সূর্য হাসিমুখেই বলল।

আমারবই.কম

ভেজা মাটির ওপর দিয়ে জোরে হাঁটলেই পা পিছলে পড়তে হবে, তবু যতটা সম্ভব জোরে হাঁটতে হাঁটতে দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় থাকেন।'

'স্কুলের পেছনে।'

'মেয়েকে আগে ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'ও তো এসেছে দিন পনেরো আগে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ধাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। পদ্ম ধাই। ওর হাত খুব ভাল। ও এসে দেখেশুনে বলল কোনও চিন্তা নেই। ঠিক সময়ে প্রসব হয়ে যাবে।' বৃদ্ধ বলল।

'তাই হাসপাতালে আমার কাছেও নিয়ে এলেন না।'

'আসলে আমাদের বাড়ির সব বাচ্চা বাড়ির আঁতুরঘরেই হয়েছে তো—।'

'তা হলে হাসপাতালে আনলেন কেন?'

'খুব যন্ত্রণা পাচ্ছে দিদি, খুব!'

বাড়িটার চালু নাম হাসপাতাল। হেলথ সেন্টারকে একটু বেশি সম্মান দিয়েছে স্থানীয় মানুষ। এখন অবশ্য সরকারি মতে এটার নাম প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। দিশার দায়িত্বে এই চিকিৎসা কেন্দ্র। মাথার ওপর আছেন ব্লক মেডিক্যাল অফিসার। তিনি সাতটি ব্লকের প্রাইমারি হেলথ সেন্টার দেখাশোনা করেন। তাঁর হেলথ সেন্টার কুড়ি মাইল দূরে।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই দিশা বুঝতে পারল তার কিছু করার নেই। বাচ্চা এবং তার মাকে বাঁচাতে হলে এখনই সিজার করা উচিত। প্রাইমারিতে দূরের কথা ব্লক হেলথ সেন্টারেও এখনও সিজার করা সম্ভব নয়। অ্যানেসথেসিয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। অপারেশন থিয়েটার নেই। এমনকী প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে ফরসেপ-এর সাহায্যে ডেলিভারি করানো প্রায় অসম্ভব। দ্রুত বৃদ্ধের কাছে চলে এল দিশা, 'ওকে এর আগে কোনও ডাক্তার দেখাননি?'

'ডাক্তার? জামাই দেখিয়েছে কি না জানি না। ও তো এই সেদিন আমার কাছে এল।'

দিশা দেখল তাদের কোয়ার্টার্সের সামনে তখন গাড়িটা দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার চাকা থেকে কাদা তোলার চেষ্টা করছে। সে বলল, 'আপনি এখনই মেয়েকে নিয়ে সদর হাসপাতালে চলে যান। নাহলে ও আজই মারা যাবে।'

'সেকী?'

'হ্যাঁ। আমার এখানে অপারেশন করা যাবে না। আপনি ওই গাড়ির ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে আসুন। ওকে বলুন নিয়ে যেতে। দেরি করবেন না!'

'কিন্তু, গাড়ির ভাড়া তো অনেক—।'

'কত? আপনার মেয়ের প্রাণের চেয়ে বেশি? আপাতত নিয়ে যান। আমি ওকে বলছি আপনি পরে টাকা দেবেন।'

বৃদ্ধ ছুটে গেল ড্রাইভারের কাছে। লোকটা প্রস্তাব শুনে মাথা নেড়ে না বলতে লাগল। দিশা আর পারল না। সে দৌড়ে যেতে যেতে পিছলে পড়তে পড়তে সামলে নিল কোনও রকমে। ড্রাইভার বলল, 'আরে, এভাবে দৌড়াচ্ছেন কেন, অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারত।'

'শুনুন, আপনার যত কাজই থাকুক, মেয়েটাকে নিয়ে সদরের হাসপাতালে না গেলে দু'জনকেই বাঁচানো যাবে না।'

'দু'জন মানে?'

'মেয়েটির পেটে বাচ্চা আছে। অপারেশন ছাড়া ও বাঁচবে না।'

'অ। দুশো লাগবে। খুব কম বললাম।'

'ঠিক আছে। তাই পাবেন। আগে ওকে বাঁচান।'

পেশেন্টকে পেছনের সিটে শুইয়ে বৃদ্ধ মাথার কাছে বসলেন। গাড়ি ছাড়ার আগে বললেন, 'কাউকে দিয়ে বাড়িতে একটু খবর পাঠাবেন। হরিদাসবাবুর বাড়ি বললেই হবে।'

গাড়ি চলে গেল। দিশা ঘড়ি দেখল। এই রাস্তা পেরিয়ে হাইওয়ে ধরে সদর হাসপাতালে পৌঁছোতে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। ততক্ষণে— মা বাঁচবে। মেয়েদের প্রাণ অত সহজে শেষ হয় না। শেষ হয়ে গেলে সারাজীবনের যন্ত্রণা সহ্য করবে কে?

বারান্দায় ওঠা মাত্র সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা কী?'

এর মধ্যে পাজামা গেঞ্জি পরে নিয়েছে হাত-মুখ ধুয়ে, সূর্যকে বেশ তাজা দেখাচ্ছিল। সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলল দিশা।

সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের ব্লক সেন্টারেও সিজার হয় না?'

'না। সেখানে তিনজন ডাক্তার, দু'জন নার্স, চারজন স্টাফ আর দু'জন গ্রামসেবিকা আছেন। কিন্তু অজ্ঞান করিয়ে অপারেট করানো সম্ভব নয়।'

'তিনজন ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। একজন এমবিবিএস, একজন হোমিওপ্যাথ আর একজন আয়ুর্বেদের।'

'বাঃ। কী কম্বিনেশন! আলাদা আলাদা চেম্বার?'

'না।' হাসল দিশা, 'একই ঘরে তিনটে টেবিল। তবে এই ব্লকের যিনি হোমিওপ্যাথ তিনি অ্যালোপেথির ওপর বেশি আস্থা রাখেন।'

'কী রকম?'

'জ্বর হয়েছে জানলে দিনে তিনটে পুরিয়া খেতে দেন যাতে আগে থেকেই ক্যালপল ট্যাবলেট গুঁড়ো করা থাকে! সত্যি মেয়েটার কী কপাল! শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে এসেছে গঙ্গা ধাইয়ের হাতে বাচ্চা হবে বলে।'

'আগে চেকআপ করায়নি?'

'এখানে এসেছে কটা দিন। শ্বশুরবাড়িতে করিয়েছে কিনা কে জানে! আর যদি করিয়ে থাকে তা হলে সেখানকার ডাক্তার নিশ্চয়ই বলেছে নর্মাল ডেলিভারি হবে না। আর সেটা জানার পরেও যদি ওর স্বামী এই অজপাড়াগাঁয়ে ধাইয়ের হাতে পাঠিয়ে দেয় তা হলে বুঝতেই পারছ ওরা বউটার মৃত্যু চাইছে।' দিশা বলল।

'সর্বনাশ। এটা তো পরিকল্পিত খুন।'

'তবে মেয়েটা মরে যাবে না।'

সূর্য হাসল, 'মেয়ে বলে?'

'ওর এখন বাঁচার চান্স আধাআধি। তাড়াতাড়ি পৌঁছে ওটিতে তুললে, ডাক্তার দায়িত্ব নিলে এবং তখন যদি ওর কন্ডিশন ভাল থাকে—। অনেকগুলো যদি। দেখো, ওর পেটে যদি ছেলে থাকে তা হলে বাঁচার চান্স কম। কিন্তু মেয়ে থাকলে ও কিছুতেই মরবে না।' দিশা সূর্যর দিকে তাকাল।

'তুমি কি আজকাল জ্যোতিষচর্চা করছ?'

'লুডোতে জোড়া গুটি থাকলে ডিঙিয়ে যাওয়া যায় না। পেটে মেয়ে থাকলে ঈশ্বর এ সুযোগ ছাড়বেন কেন? মা ও মেয়ের জোড়া কপালে অনেক দুঃখ লেখার সুযোগ পাবেন, মেরে ফেললে ভদ্রলোক হতাশ হবেন না!' ঘরে ঢুকে গেল দিশা।

এইসময় বৃষ্টি আরম্ভ হল। সূর্য খানিকক্ষণ তাকাল বাইরের দিকে। দিশার এই একটা ব্যাপারে বদ্ধ ধারণা আছে। অথচ মেয়ে হিসেবে ও কখনই অত্যাচারিত হয়নি। সূর্য কোনওদিন ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি।

'এই ভেতরে এসো, চা দিয়েছে।' দিশার গলা ভেসে এল।

ভেতরে ঢুকে সূর্য অবাক। লুচি বেগুনভাজার প্লেট দেখে বলল, 'আরে! তুমি দেখছি এখানে জব্বর সংসার সাজিয়ে বসেছ!'

'বাঃ, থাকতেই যখন হবে তখন না বসে উপায় কী! তুমি শুরু করো আমি হাতমুখ ধুয়ে আসছি।' দিশা বাথরুমে চলে গেল।

গরম বেগুনভাজার সঙ্গে লুচি সূর্যর খুব প্রিয় মেনু। দিশা এটা মনে রেখেছে দেখে সে খুশি হল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে নিজের প্লেট নিয়ে দিশা চেয়ারে

বসল, 'তুমি এলে এত কষ্ট করে আর সঙ্গে সঙ্গে এমন ব্যাপার ঘটে গেল। খারাপ লাগছে।'

'তুমি জীবন অস্বীকার করতে পারো না। ফুলশয্যার রাত্রের কথা মনে আছে?'

'মনে নেই? লোকটার নামও ভুলিনি, হারাধন হালদার। বদমাশ।'

'আহা, বিপদে না পড়লে কেউ রাত দুটোর সময় ফোন করে না।'

'কিন্তু কথাবার্তাগুলো? বিচ্ছুটি মাখানো। আমি বলেছিলাম উনি এখন ঘুমোচ্ছেন, কাল ভোরে যদি যান তা হলে কি অসুবিধে হবে? সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বলল 'হবে। আমি জানি উনি এখন সুখনিদ্রা দিচ্ছেন। ফুলশয্যার মধ্যরাত্রে আমিও দিয়েছিলাম কিন্তু উনি যদি এখন না আসেন তা হলে কাল সকালে আমার স্ত্রীকে জীবিত নাও দেখতে পারি। তার বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে, নিশ্বাসে কষ্ট। প্লিজ, ওকে বলুন।' দিশা গলা নকল করল।

সূর্য বলল, 'হ্যাঁ, সেই রাত্রে বেরিয়ে আমি ভোরে ফিরেছিলাম। আমার ফুলশয্যার রাত চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। জানো, গিয়ে যখন বুঝলাম বুকের ব্যথার কারণ আজেবাজে খাওয়ার জন্যে উইন্ডের চাপ বাড়ছে, বমি করালেই আরাম পাবে তখন খুব রাগ হয়েছিল। ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হয়েছিল বউয়ের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।'

'সেটা জানার পরেও তুমি কিন্তু ফিরে আসোনি।'

'আসতে দেয়নি। দূরে কোথাও একটা বোম ফাটার আওয়াজ হল আর অমনি ওরা আমাকে জোর করে আটকে দিল। কেন দিল তা আমি তোমাকে বলিনি।'

'তোমার গায়ে বোম পড়তে পারে এই ভয়ে।'

'দূর।'

'তা হলে?'

'হারাধনবাবুর ফুলশয্যার রাত্রে ওঁর ঠাকুর্দাকে হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছিল। বাড়ির ছেলেরা হাসপাতালে রাত কাটিয়েছিল, মেয়েরা জেগে। তার পরের দিন ঠাকুর্দা মারা যান এবং অশৌচ শুরু হয়ে যায়। অতএব ঠাকুর্দার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর ওদের অফিসিয়াল হনিমুন হয়।'

'সেকী!'

'আরও আছে। তারপর থেকে প্রত্যেক বছর ফুলশয্যার তারিখ যেদিন পড়ে সেই রাতে ওঁরা জেগে থাকেন। আলাদা থাকা আরম্ভ হলে কোনও না কোনও পরিচিত মানুষকে ডেকে নিয়ে এসে আটকে রেখে গল্প করেন। তারপর তাদের সংখ্যা শেষ হয়ে গেলে এক একবার এক একজনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলে

ডাক্তারকে কল দেন। সেই বছরের ফুলশয্যার রাতটা ডাক্তার থাকলে ওদের মন্দ কাটত না।'

'কিন্তু যাকে মিথ্যে করে আটকে রাখা হয়—!'

'তার কষ্টটা দেখে ওরা প্রথম ফুলশয্যার দুঃখটা ভুলতে চেষ্টা করত।'

'এরা পাগল।' দিশা মন্তব্য করল।

চা খাওয়ার পর দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ির নতুন খবর কিছু আছে?'

'সবাই তোমার বিরহে কাতর।'

'তুমি?'

'ভাবতে হবে।'

'ভাবো বসে বসে। দুপুরে খিচুড়ি খাবে?'

'সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা।'

'অদ্ভুত। এই অজ পাড়াগ্রামে ইলিশ পাওয়া যায়? মাছ পাই সপ্তাহে একদিন। এখানে ইলিশ আর পারিজাত একই বস্তু।'

'পারিজাত?'

'স্বর্গের ফুল।'

সূর্য উঠল। নিজের ব্যাগটা খুলল। তারপর কাপড়ে জড়ানো একটা পুঁটলি স্ত্রীর হাতে দিল। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কী এটা?'

'খুলেই দ্যাখো।'

কাপড়ের বাঁধন খুলতেই সেলোফেন কাগজের মোড়ক। সেটা খুলতেই একটা বড় স্টিলের বাটি বেরিয়ে এল। দিশা একবার সূর্যর দিকে তাকিয়ে দু'হাতে বাটির টাইট মুখ খোলার চেষ্টা করতে লাগল। শব্দ করে ঢাকনা খুলতেই দিশা চিৎকার করে উঠল।

'আরে। কী দারুণ ব্যাপার।' তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তুমি না, তুমি না—।'

'একটা চুমু খাও।'

'কী?'

'ওনলি একটা। এতক্ষণ এসেছি অথচ একবারও চুমু খাওনি।'

'পাগল। কাজের মেয়েটা আছে না। এই গ্রামে রটে যাবে ডাক্তারদিদি চুমু খায়।'

'খাওয়ার জিনিস খেলে দোষ হয় না, এই গ্রামের যেসব মানুষের লিগ্যাল রাইট আছে চুমু খাওয়ার তারা কি উপোস করে থাকে?'

বাটিটা নাকের কাছে নিয়ে এসে নিশ্বাস নিল। 'দারুণ। গঙ্গার?'

'পদ্মার।'

'ওঃ, কতদিন পরে ইলিশ খাব। এই শোনো, এখানে অনেক পিস আছে, এখানকার কয়েকজনকে দু'-চারটে দিয়ে দেব। ওরা খুব খুশি হবে।'

'যা ইচ্ছে করো। আমার কোনও আগ্রহ নেই। সব দিয়ে দিতে পারো।'

'এই, তুমি নিশ্চয়ই রাগ করেছ?'

'হ্যাঁ, আমি হাসিমুখে লি হয়ে থাকব।'

'লি হয়ে থাকব মানে?'

'বাংলা স্বরবর্ণ যার কোনও প্রয়োগ নেই।'

চোখ পাকাল দিশা। তারপর গলা তুলে ডাকল, 'যশোমতী।'

'বলুন।' চিঁচি গলার আওয়াজ শোনা গেল।

'তোর কাজ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তুই এখন বাড়ি চলে যা।'

'না গো দিদি। মা বলেছে তোমার কাছে আজ লোক আসবে তাই থাকতে।'

'লোক?' চেঁচিয়ে উঠল সূর্য, 'আমি তোমার কাছে লোক হয়ে এসেছি।'

'আহা চুপ করো। এদের কথার ধরন ও রকম। তোর মা খুব ভাল। তুই এক কাজ কর। একটা বাটি নিয়ে আয় এখানে।' দিশা বলল।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বাটি নিয়ে হাজির। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে তোরা ক'জন? চার না পাঁচ?'

'পাঁচ।'

'তোর কথা ধরছি না। তুই তো এখানে খাবি।' চারটে ইলিশ মাছের টুকরো বাটিতে দিয়ে দিশা বলল, 'ছাতি নিয়ে বাড়িতে গিয়ে মাকে দিবি। বলবি দাদাবাবু এনেছে কলকাতা থেকে। পদ্মার ইলিশ। ঝোল করে সবাই যেন খায়।'

'ইলিশ? ইলিশ মাছ?' যশোমতীর মুখ পূর্ণিমা।

'হ্যাঁ। খাসনি কখনও?'

'না। শুনেছি খুব ভাল খেতে। আমি যাই।'

'তাড়াতাড়ি আসবি।'

মেয়েটিকে ছাতি মাথায় ছুটতে দেখে দরজা বন্ধ করল দিশা। জানলা দিয়ে তখনও মেয়েটার যাওয়া দেখছিল সূর্য। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'মনটা কীরকম ভরে গেল দিশা। একটা মেয়ে জীবনে কখনও ইলিশ মাছ

আমারবই.কম

খায়নি শুধু নাম শুনেছে, আজ তার স্বাদ নেবে। তুমি ব্যাপারটা ভাবতে পারছ!'

দু'হাতে জড়িয়ে ধরল দিশা সূর্যকে। মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'এই জন্যে তোমাকে এত ভালবাসি। ইউ আর গ্রেট।' সজোরে ঠোঁট চেপে ধরল সে সূর্যর ঠোঁটে। তারপর মুখ রাখল বুকে। ফিসফিস করে বলল, 'আঃ কী শান্তি।'

বিয়ের আগে রান্নাঘরে যাওয়ার সময় হত না। মাঝে মধ্যে শখ হলে মাংস রান্না করার চেষ্টা করত। দু'-তিনবারে সেটা এমন ভাল হয়ে গেল যে বাড়িসুদ্ধু লোক তারিফ করত। তারপর থেকে বাড়িতে মাংস এলেই মা বলত, 'হ্যাঁরে, মাংসটা রেঁধে দিতে পারবি?' হাত নেড়ে প্রস্তাবটা নাকচ করে দিত দিশা। তার সময় নেই। পড়ার চাপ তখনও প্রবল।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে শাশুড়ির কথা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল, 'তোমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে না দিশা। তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকো।' তবু এ বাড়িতেও মাংস এলে দিশা এগিয়ে যেত। 'মা, আমি বোধহয় খারাপ রাঁধব না। দেবেন রাঁধতে?'

শাশুড়ি হাসতেন, 'ওমা, একী কথা। ইচ্ছে হয়েছে যখন তখন নিশ্চয়ই রাঁধবে। আমি তোমাকে নিষেধ করেছি অন্য কারণে। বাঙালি মেয়েদের জীবনের ছয় ভাগের এক ভাগ সময় এই রান্নাঘরে কেটে যায়। কারণটা কীরকম অন্তঃসারশূন্য। বাড়ির বউ না রাঁধলে ছেলেদের মন ভরে না। আমাকে দিয়ে তো দেখলাম। বিয়ের পর কথা বলতে পারতাম না। কাজকর্ম করার যোগ্যতা ছিল না, বাড়িতে বসে বসে অন্ন ধ্বংস করব, তার চেয়ে রান্না করে নিজেকে ব্যস্ত রাখি। ওরাও দেখবে আমি কাজ করছি। তোমার বেলায় তা হবে কেন? তোমার তো বাইরে কাজকর্ম আছে।'

শাশুড়িকে খুব ভাল লেগে গিয়েছিল দিশার। প্রায় বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ক্রমশ আবিষ্কার করল, দুপুরে ভদ্রমহিলা বই পড়েন। আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজি, রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ, আধুনিক লেখকের নারীচরিত্র-প্রধান উপন্যাস থেকে ইবসনের ডলস হাউসের বাংলা অনুবাদ ওঁর সংগ্রহে আছে। এগুলো নিজে পয়সা জমিয়ে কিনেছেন। বললেন, 'তুমি এসে গেছো, আমার খুব সুবিধে হল।'

'কী রকম?' দিশা জিজ্ঞাসা করেছিল।

'বইমেলায় খোকাকে বলতে বলতে হয়তো একদিন নিয়ে যায়। তোমার

শ্বশুর তো ধুলোর অছিলায় ওদিকে যেতেই চান না। আমার তো পুজো ওই একটাই। হাজার হাজার বইয়ের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে যে কী ভাল লাগে! এবার তোমার সঙ্গে যাব। তুমি তো বইমেলায় চার-পাঁচ দিন যাও।'

হেসে ফেলেছিল দিশাও, 'আপনি কী করে জানলেন?'

'তোমার বরের মুখে শুনেছি।'

শ্বশুরমশাই মানুষ হিসেবে বেশ ভাল। একটু ঘরকুনো। সকাল থেকে গোটা চারেক খবরের কাগজ মুখে নিয়ে বসে থাকেন। ভাল চাকরি করতেন, পেনশন পান। আর্থিক কোনও সমস্যা নেই। দিশার সঙ্গে কথা বলার সময় এমন নিচু গলায় বলেন যে শাশুড়িও অবাক হয়ে যান। হেসে বলেন, 'তোমার শ্বশুরের গলা এত নিচুতে কেন বলো তো?'

'কেন?'

'ওঁর মনে হয় জোরে কথা বললে যদি কর্কশ শোনায় আর তোমার খারাপ লাগে তাই—।' বলতে বলতে হেসে ওঠেন মহিলা।

এ রকম শ্বশুর-শাশুড়ি পাওয়া নাকি বাঙালি মেয়েদের ভাগ্যে সচরাচর ঘটে না। বাপের বাড়িতে গেলেই মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চান ওরা কীরকম ব্যবহার করছে। বাবা আবার একটু উলটো। বলেন, 'শোনো, তুমি ডাক্তারি পাশ করেছ সংসার করার জন্যে নয়। তোমার পেছনে সরকারেরও অনেক টাকা খরচ হয়েছে। তোমার কর্তব্য মানুষের সেবা করে সেই টাকার মূল্য ফেরত দেওয়া।' অর্থাৎ তুমি কাজকর্ম করো।

শেষ পর্যন্ত সরকারি চাকরি করবে বলে স্থির করল দিশা। পেয়েও গেল। যেদিন কাগজপত্র হাতে এল সেদিন সূর্য একটু গম্ভীর হয়ে ছিল। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলো?'

'তোমার সঙ্গে রোজ দেখা হবে না।' সূর্য ছেলেমানুষের গলায় বলেছিল।

'তুমি যাবে, আমিও আসব।'

'সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে তোমাকে দেখতে পাব না।'

'এই তুমি এ রকম করে বললে আমি যেতে পারব না।'

'না। ঠিক আছে। তোমার কথাও তো ভাবতে হবে। শুধু এত দূরে না হয়ে যদি কলকাতার কাছাকাছি হত—।'

'বলছে তো তিন বছর পর ফিরিয়ে আনবে।'

'তিনটে বছর কি সোজা কথা!' সূর্য মুখ নামিয়েছিল।

'তা হলে ছেড়ে দিই। কী বলো?'

সূর্য তাকিয়েছিল স্ত্রীর মুখের দিকে, 'কিছুদিন করে দ্যাখো।'

শাশুড়ি এবং শ্বশুরমশাই চিন্তিত মুখে বসে ছিলেন। দিশা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওঁদের সামনে। শ্বশুর একবার দেখে মুখ নামিয়ে নিলেন, শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করবে?'

দিশা বুঝতে পারল ছেলের কাছে খবরটা এঁরা জেনেছেন।

সে বলল, 'আপনারা যা বলবেন!'

শাশুড়ি তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কিছু বলার আছে?'

'কী বলব!' শ্বশুর সরাসরি তাকালেন না! 'মানে, অত দূরে চলে যাবে, একা থাকতে হবে, ভাবতে ভাল লাগছে না। শুনলাম ওটা নাকি গ্রামের প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। তার মানে বেশ অজ পাড়াগ্রাম হবে। আমি বলি কী বেহাই মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো, তিনি কী বলেন শোনো। ওঁর কথার তো একটা বড় মূল্য আছে।'

'তিনি যদি দিশাকে জিজ্ঞাসা করেন তোর শ্বশুরের মত কী, কী বলবে ও?'

শাশুড়ির কথায় বউমাকে দেখলেন শ্বশুর, 'আমার ইচ্ছে এ ব্যাপারে বউমাই সিদ্ধান্ত নিক।'

শাশুড়ি মাথা নাড়লেন, 'না। আমার মোটেই ভাল লাগছে না। অত বেখে ঢেকে কথা বলতে আমি পারি না। তুমি অত দূরে চাকরি করতে গেলে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে। তোমার জন্যে যেমন দুশ্চিন্তা হবে নিজের জন্যেও খারাপ লাগবে। ছেলের বিয়ের আগে মুখ বুজে সময় কাটাতাম; তুমি আসার পর সব কিছু বদলে গিয়েছে।'

'তাই বলে জোর করে তুমি বউমাকে আটকে রাখতে পারো না।'

'আশ্চর্য! আমি জোর করেছি? আমি শুধু আমার মনের কথা বলেছি।'

দিশা হেসেছিল, 'আচ্ছা মা, আপনার ছেলে যদি এই চাকরি পেত তা হলে যেতে দিতেন?'

'একটুও আপত্তি করতাম না। কারণ ও গেলে আমার মন খারাপ হত না।'

শ্বশুর বললেন, 'এটা তুমি সত্যি বললে না বোধহয়।'

'মোটেই না। সে বাড়িতে থাকে কতক্ষণ যে কথা বলব।' শাশুড়ি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন।

বাপের বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিতেই মা হাঁ হাঁ করে উঠল, 'ওমা, একি কথা! তুই এই বয়সে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবি নাকি? ও রকম ধ্যাড়ধেড়ে গ্রামে তোমাকে যেতে হবে না।'

'আশ্চর্য! আমি চাকরি করব না?' দিশা প্রতিবাদ করেছিল।

'কেন? এখানে ডাক্তারদের চাকরি নেই! পিজি হাসপাতালে অ্যাপ্লাই কর। কোনওদিন বলিনি এবার বলছি। মাসিমার দেওরের ছেলে মন্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে করেছে। ঠিক পিজিতে চাকরি করে দেবে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও পারবে না পিজিতে সরাসরি চাকরি দিতে। নতুন ডাক্তারদের গ্রামে যেতেই হবে।' দিশা বলেছিল।

'হোয়াট গ্রাম?' বাবা চেঁচিয়েছিলেন, 'ওখানে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে পারবে? না আছে ওষুধ, না আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা। এতদিন পরিশ্রম করে, কত অর্থ খরচ করে তুমি ডাক্তার হয়েছ নিজেকে নষ্ট করতে? তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি দেখছি বেলভিউ বা ও রকম কোথাও ট্রেনি ডাক্তার হিসেবে ঢোকাতে পারি কি না।'

'এভাবে হয় না বাবা।'

'কীভাবে হয়? সূর্যর মতো! দশটা পঞ্চাশ টাকার জন্যে রাত বারোটা পর্যন্ত এর বাড়ি তার বাড়িতে দৌড়াচ্ছে! এখন যে কোনও মাঝারি ডাক্তার চেম্বারে দেখালে দুশো টাকা নেয়। তোমার শ্বশুর শাশুড়ি কী বলেন? যেতে বলছেন?' বাবা তাকালেন।

'না। তাদেরও আপত্তি আছে।' নিচু গলায় বলেছিল দিশা।

'গুড। শুনে ভাল লাগল।' বাবা বলেছিলেন।

'সূর্য কী বলছে?' মা জিজ্ঞাসা করেছিল?

'আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে।'

বাপের বাড়ি থেকে ফেরার সময় দিশা স্থির করেছিল এত লোকের আপত্তি অগ্রাহ্য করার কোনও মানে হয় না। এখানেই যে রকম টুকটাক চালিয়ে যাচ্ছে তাই যাবে।

বাড়িতে ফিরে দেখল যথারীতি সূর্য নেই। সন্ধের এই সময় তার থাকার কথা নয়। এই কয়বছরে সূর্যর ভাল নাম হয়েছে। অল্পবয়সি ডাক্তারের ওপরেও এলাকার মানুষের ভরসা বাড়ছে। দিশার প্রায়ই মনে হয় এম বি বি এস কোর্সে একটা স্পেশ্যাল পেপার থাকা উচিত, সেটা পাবলিক রিলেশনের। কীভাবে হাসিমুখে পেশেন্টের কাঁদুনি শুনতে হবে, কীভাবে তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে এগুলো ভাল না জানলে কোনও ডাক্তারের মাটি থেকে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। খুব বড় নামি-দামী ডাক্তার হলে তাঁর সব মেজাজ পেশেন্ট মুখ বুজে সহ্য করে তাঁর কাছেই যাবে। আর নতুনদের সামান্য মেজাজ দেখলেই তার চেম্বার ফাঁকা

হয়ে যাবে। ওদের ব্যাচের যারা প্র্যাকটিসে এসেছিল তাদের অনেকেই সাফল্য না পেয়ে সরকারি চাকরি বা নার্সিংহোমগুলোতে জুনিয়ার ডাক্তার হিসেবে চলে গেছে। সূর্য কেন সফল হল? তার অন্যতম কারণ ও রকম হাসিহাসি মুখ করে পেশেন্টের ধারাবিবরণী শোনার ধৈর্য খুব কম মানুষের আছে। ধরা যাক রাত এগারোটায় কোনও বাড়িতে গেল সূর্য। গৃহকর্তা শয্যাশায়ী। ঢুকেই বলল, 'অনেকক্ষণ আপনাকে জাগিয়ে রেখেছি, খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই তো?'

পেশেন্ট বলল, "হ্যাঁ মানে, পেটের ভেতরটা কেমন গুলিয়ে আছে। কিছুই খেতে পারছি না। মনে হচ্ছে খেলেই বমি হয়ে যাবে।'

'দেখি একটু।' স্টেথো দিয়ে বুক পেট পরীক্ষা করে পাশে দাঁড়ানো ওঁর স্ত্রীকে সূর্য বলেছে, 'এই বয়সে এত ভাল হার্ট খুব কম দেখা যায়।'

'আমার হার্ট ভাল?' ভদ্রলোকের মুখ চোখ বদলে গেল।

'খুব ভাল। রাত্রে একটু ভাত, পাতলা ঝোল দেননি ওকে?' স্ত্রীকে প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। মাছের ঝোল দিয়েছিলাম।'

'খাওয়া যায় না ভাই, না আছে মশলা, না ঝাল।' ভদ্রলোক মুখ বিকৃত করলেন।

'না না না। তা কেন? হালকা মশলা দেবেন। পেটটা দেখি।'

পরীক্ষা করার পর সূর্য উঠে দাঁড়াবে, 'আর দুটো দিন কষ্ট করুন। ঠিক হয়ে যাবে, ওষুধগুলো পালটাব না। মনে করে খাবেন কিন্তু।'

স্ত্রী বললেন, 'বিকেলে পুডিং খাওয়ার জন্যে বায়না করছিল। আমি তা না দিয়ে একটু পায়েস করে দিয়েছি।'

'ভাল করেছেন। তবে দু'দিন আর দেবেন না।' সূর্য বলল।

'শুনলে তো। ডাক্তার বলল, ভাল করেছ। আচ্ছা ডাক্তার আমার হাঁটুতে একটু ব্যথা ব্যথা লাগছে। টয়লেট যাওয়ার সময় টের পেলাম। দ্যাখো তো!'

আবার হাঁটু পরীক্ষা করল সূর্য। হেসে বলল, 'ভাল লক্ষণ।'

'মানে?'

'পেট থেকে হাঁটুতে নামছে ব্যথাটা। এরপরে গোড়ালি দিয়ে বেরিয়ে যাবে।'

স্ত্রী একটা প্লেটে সন্দেশ আর একগ্লাস জল সামনে ধরলেন। সূর্য মাথা নাড়ল। 'না না এত রাত্রে—!'

'ডাক্তার, এখনই কি বাড়ি ফেরা হচ্ছে?' ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। এখনও দু'জন পেশেন্ট আছেন।'

'খেয়ে নাও। তা হলে পিত্তি পড়বে না।' ভদ্রলোক নেমে আসেন বিছানা

থেকে অতএব জলমিষ্টি খেতে হয় সূর্যকে। ভদ্রলোক একশো টাকার নোট বের করতেই সূর্য হাসে, 'আপনি পাগল হয়েছেন! পুরনো পেশেন্টদের কাছে আমি পঞ্চাশের বেশি নিই না।'

দিশার পক্ষে এত ভাল অভিনয় করা সম্ভব নয়। সে জামা-কাপড় না ছেড়েই খাটে শরীর এলিয়ে দিয়েছিল। এইসময় শাশুড়ি ঘরে এলেন। তাঁকে দেখে উঠে বসতে যাচ্ছিল কিন্তু তিনি বললেন, 'আরে! উঠতে হবে না। শুয়ে থাকো।'

তবু আধশোওয়া হল দিশা। শাশুড়ি বসলেন পাশে। তারপর বললেন, 'অনেক ভাবলাম।'

'কী ব্যাপারে?'

'তোমার চাকরি করা নিয়ে।'

'না মা। আমি ঠিক করেছি ওটা নেব না।'

শাশুড়ি তাকালেন, 'কেন?'

'সবাই চাইছেন অত দূরে আমি যেন না যাই। বাবা মাও আজ এক কথা বললেন। আপনার ছেলের প্রথমে ইচ্ছে ছিল না, শেষ পর্যন্ত বলল, কিছুদিন চাকরি করে দেখতে। তাই এত মানুষের ইচ্ছের বিরুদ্ধে চাকরিটা নেওয়া ঠিক হবে না।' দিশা বলল।

'বেশ। আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব!'

'বলুন।'

'তুমি যখন জয়েন্ট দিয়ে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলে তখন তোমার বর বা আমরা কেউ কি পাশে ছিলাম?' শাশুড়ির মুখ হাসিহাসি।

'না। তখন তো—।'

'তুমি মনে প্রাণে চেয়েছিলে ডাক্তার হবে। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা এখন হয়েছ কিন্তু কাজের জায়গা তেমন পাচ্ছ না। ঠিক কিনা।'

'ঠিক।'

'ওখানে গেলে সেটা পাবে। এখনও দূর দূর গ্রামের মানুষ শুধু চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। তুমি তাদের একশোজনের একজনকে বাঁচিয়ে তুলতে পার তা হলে ডাক্তারি পড়া সার্থক হবে। ঠিক বলছি?'

'তা ঠিক—।'

'আর যদি তুমি না যাও, বিরক্ত হয়ে বাড়িতে বসে থাকো তা হলে তোমার বিদ্যেয় মরচে পড়তে বাধ্য। একসময় অলস হয়ে যাবে। তখন সংসার করবে আর সেটাই হবে তোমার পরিচয়। আমার সঙ্গে তোমার কোনও পার্থক্য থাকবে না।'

দিশা উঠে বসেছিল। এ রকম কথা সে শুনবে ভাবতে পারেনি।

'স্বামী-স্ত্রী এই দু'জনের জন্যে সংসার। স্বামী রোজগার করবে আর স্ত্রী সংসার করবে, টাকার জন্যে স্বামীর কাছে হাত পাতবে এ কেমন নিয়ম? স্ত্রী রোজগার করছে আর স্বামী সংসার সামলাচ্ছে এটা যেমন সমাজ মেনে নিতে পারছে না তা হলে দু'জনে মিলে ওই দুটো কাজ করুক। দিশা, চাকরি করলে শুধু মানুষের প্রতি কর্তব্য করাই হবে না, মাইনে বাবদ যা পাবে সেটাই তোমার অহংকার। তোমাকে সূর্যর কাছে হাত পাততে হচ্ছে না। তা না হলে তোমার সঙ্গে একটি অশিক্ষিত মেয়ের তফাত কোথায়?'

'আপনি, আপনি আমাকে চাকরিটা নিতে বলছেন?'

'হ্যাঁ বলছি। তখন নিজেদের কথা ভেবেছিলাম বেশি, তাই আপত্তি করেছিলাম। পরে অনেক ভাবলাম। আমাদের সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হলেও শেষ পর্যন্ত আমরাই আত্মসমর্পণ করতাম। কারণ কোথাও যাওয়ার জায়গা আমাদের ছিল না। তা ছাড়া তখন পরিবার বলতে শুধু স্বামী-স্ত্রী বোঝাত না। এখন দ্রুত দিন বদলাচ্ছে। কে বলতে পারে তোমার সঙ্গে সূর্যর মানসিক ব্যবধান শুরু হয়ে বেড়ে যেতে লাগল। এখন তো সহজেই মানুষ অসহিষ্ণু হচ্ছে। সেই দিন যদি আসে তা হলে তোমাকে তার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। কখনই নিজের সম্মানের বিনিময়ে কোনও সমঝোতা কোরো না দিশা।' শাশুড়ি ওর হাত ধরলেন।

দিশা আর পারল না। দু'হাতে শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ তার মনে হল নিজের মায়ের কাছে সে যা পায়নি তা এই ভদ্রমহিলা তাকে দু'হাত ভরে দিয়েছেন।

সে হাত সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'সূর্যর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেন কখনও ও রকম না হয়।'

'হবে না। আমাদের আশীর্বাদ আছে না?'

'তবু যদি হয়, যদি, তা হলে আমার আর ভয় নেই।'

'হ্যাঁ। চাকরিটা তোমাকে তখন শক্তি দেবে।'

'না। চাকরি নয়। আপনাকে আমার পাশে পাব। সেটাই আমার শক্তি।'

'এই মেয়ে! আমার মন জুগিয়ে কথা বলা হচ্ছে!' শাশুড়ি উঠলেন, 'চা খাবে?'

'আমি করছি।' নেমে দাঁড়াল খাট থেকে দিশা।

'বেশ করো। তোমার শ্বশুরকে একটু দিয়ো। ওরটা চিনি ছাড়া কিন্তু—।'

সেই রাত্রে সূর্য বাড়ি ফিরেছিল পৌনে বারোটায়। তখন প্রায় ছিবড়ে হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। পকেট থেকে টাকা, কাগজ, বের করে জিজ্ঞাসা করল, 'আছ কেমন?'

'কোনও কথা নয়। আগে খেয়ে যাও।'

'দাঁড়াও, স্নান করে নিই।'

বললেও শুনবে না। স্নান সেরে সূর্য যখন খাচ্ছিল তখন উলটোদিকের চেয়ারে দিশা বসে। শাশুড়ির সঙ্গে তাকে খেতে হয় রাত দশটার মধ্যে। সূর্যর জন্যে অপেক্ষা করার কথা বলতে বলেছিলেন, 'ও যদি রাত দুটোয় বাড়ি ফেরে তুমি জেগে থাকবে?'

শাশুড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।'

'কীসের সিদ্ধান্ত?' সূর্য খেতে খেতে তাকাল।

'দিশা চাকরি করতে যাবে।'

'ভালই তো।'

'তুই মাসে অন্তত দু'বার ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবি। আর ও একবার অন্তত একদিনের জন্যে হলেও এখানে ঘুরে যাবে।' শাশুড়ি বললেন।

'অসম্ভব। মাসে দু'বার গেলে আমার পেশেন্টরা আমাকে ধরে প্যাঁদাবে। আমি একবার ম্যানেজ করব। দিশা, প্লিজ!'

দিশা হাসল। শাশুড়ি বললেন, 'তোর কাছে বউয়ের থেকে পেশেন্টরা বড় হল?'

'তা না মা। তুমি বুঝতে পারছ না। আচ্ছা দেখি।'

ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় আসতেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল সূর্য। চুপচাপ।

ঘর অন্ধকার। কিছুক্ষণ পরে দিশা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী করব?'

'যাও। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো।'

'তুমি এভাবে কথা বলছ?'

সূর্য হাসল, 'সত্যি কথা কি সব সময় বলা উচিত?'

'আমি ভেবেছিলাম যাব না। তারপর মায়ের কথা শোনার পর—।'

'মা কী বলল?'

'নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত।'

'ঠিক।'

'আমার খুব কষ্ট হবে। তোমাকে দেখতে পাব না ভাবতেই পারছি না।'

'কষ্ট তো আমারও হবে।'

'তিন তিনটে বছর। ছত্রিশ মাস। উঃ।'

'এই ছত্রিশ মাসে আমাদের বাহাত্তর বার দেখা হবে।'

'মোটে বাহাত্তর।'

সূর্য আর কথা বলল না। তার হাতের তলায় তখন ঘাম জমছে।

একটি পুরুষ তিনমাস একা থাকলে যতটা ছন্নছাড়া হয়ে থাকত তার থেকে অনেক ভাল ব্যবস্থা করেছে দিশা। নিজের জন্যে যতটা নয়, মাসে একবার সূর্য আসবে, এসে যাতে খুব অসুবিধায় না পড়ে সে-ব্যাপারে খেয়াল থাকায় এবার সূর্যর মনে হল দিশা বেশ জমিয়ে সংসার করছে। যদিও একটা বড় তক্তপোশ আর টেবিল চেয়ার ছাড়া কোনও আসবাব নেই। জামাকাপড় রাখার জন্যে একটা আলনার ব্যবস্থা করেছে দিশা। খেতে হচ্ছে মাটিতে আসন পেতে। কিন্তু মাথার ওপর যে ফ্যানটা আছে তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইচ্ছেমতো। খাওয়ার সময় ওই কাণ্ড হওয়ায় দিশা বিব্রত হল। বলল, 'দাঁড়াও, মেয়েটাকে ডাকি, ও তোমাকে বাতাস দিক।'

সূর্য উড়িয়ে দিল ওই প্রস্তাব, 'পাগল নাকি। কলকাতায় লোডশেডিং হলে কে হাওয়া করে! তুমি মনে হচ্ছে আমাকে জামাই হিসেবে ট্রিট করছ।'

'জামাই তো! কাল থেকে এখানকার সবাই জানে আজ জামাইবাবু আসবে।'

'হঠাৎ এই প্রচার? গত দু'বারে তো শুনিনি কথাটা।' খেতে খেতে বলল সূর্য।

'একজন পুরুষমানুষ কিছুদিন অন্তর আমার কাছে আসছে দেখে শেষ পর্যন্ত এরা কৌতূহল চেপে রাখতে পারেনি। জামাই ডাক্তার শুনে আরও বিগলিত। ইলিশ কেমন হয়েছে?'

'ফার্স্ট ক্লাস।'

'তুমি এত মন রেখে কথা বলতে পার!' দিশা বলল, 'তোমার মায়ের হাতের রান্না খাওয়ার পর এটাকে কী করে ফার্স্ট ক্লাস বলছ!'

খাওয়া দাওয়ার পর চেয়ার টেনে বারান্দায় বসে ছিল সূর্য। দ্বিতীয় চেয়ারটাকে পাশে রেখেছিল। দিশা এসে বসল সেটায়। 'ঘুমাবে না? সারারাত জেগে এসেছ!'

'এই লোডশেডিং-এ ঘরে ঘুম আসবে না। আজ তোমার ছুটি?'

'প্রায় তাই। বিকেলে একবার যাব!'

'কতক্ষণ আলো থাকে এখানে?'

'সত্যি। এই এক জ্বালা। গ্রামবাংলায় বিদ্যুতের কী হাল তা তো মন্ত্রী মশাইরা জানেন না।'

'ঠিকই জানে। মুখে বলে না। তোমার সাবডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার কী রকম লোক?'

'ভাল। সপ্তাহে একদিন আসেন। আমাকে মা এবং আপনি বলেন।'

'বয়স কত?'

'সামনের বছর রিটায়ার করবেন।'

'যাক! তবু রক্ষে।'

'মানে? ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'দ্যাখো। তোমার মতো সুন্দরী মহিলা এখানে একা থাকেন দেখার পর যে কোনও পুরুষের বুকে দরদ উথলে উঠতে বাধ্য। আমি হলে আমারও উঠত।'

'আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি প্রেম করতে ছুটতে?'

'প্রেম কে বলেছে! একটু সঙ্গ পাওয়া, টুকটাক কথা বলা, এই আর কী!'

'ভদ্রলোক আমার বাবার বয়সি। শুনেছি অল্প বয়সে প্রেমে আঘাত পেয়ে আর বিয়ে করেননি।'

'তা তো হবেই। বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে।'

'যাক। তোমাকে আর পরচর্চা করতে হবে না। এবার বলো তো, খোঁজ খবর নিয়েছ?'

'নিয়েছি। মন্ত্রীর সেক্রেটারিকে ধরতে হবে। অবশ্য ধরলেই যে কাজ হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। শুধু কথায় তো চিড়ে ভেজে না। অনিল বলছিল, পুলিশের মতো রাইটার্সেও নাকি বদলির জন্যে টাকা-পয়সার খেলা চলে। কিন্তু টাকাটা কাকে দিতে হবে তাই জানি না।'

'আমি জানি না। তিনবছর এখানে আমি একা থাকতে পারব না। কলকাতায় তো হবে না, ডায়মন্ডহারবার কিংবা ব্যান্ডেল হলেও আমার হবে। যে করেই হোক কোথাও একটা করতে হবে। তোমার কি ইচ্ছে আমি এখানে

পড়ে থাকি!' দিশা হতাশ গলায় বলল।

সূর্য মাথা নাড়ল। না, সে মনেপ্রাণে চায় না। এ রকম একটা জায়গায় দিশার কিছু হয়ে গেলে জানতে জানতে অনেক সময় পেরিয়ে যাবে। আর জানার পর এখানে আসাও সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব নয়। সে মাথা নাড়ল, 'দেখি, একটা কিছু তো করতেই হবে।'

দিশা বলল, 'পার্টি লেভেলে যদি মুভ করা যায়—।'

'আমি তো কখনও সক্রিয় রাজনীতি করিনি। আমাকে ওরা পাত্তা দেবে কেন?'

'তোমার কোনও পেশেন্ট পার্টি বড় কোনও পোস্টে নেই?'

বলতেই মনে পড়ে গেল। হিরণ্ময় সেনের সঙ্গে তার কখনই মুখোমুখি কথা হয়নি। কিন্তু ওঁর বাবা জগন্ময়বাবুকে দেখতে সে অন্তত তিনবার ওই বাড়িতে গিয়েছে। প্রেশারের পেশেন্ট জগন্ময়বাবু। আগে নাকি ওষুধ খেয়েও ঠিক কন্ট্রোলে থাকত না প্রেশার। হিরণ্ময়ের মায়ের ধারণা সূর্যর চিকিৎসায় থাকার ফলে অনেক উন্নতি হয়েছে তার স্বামীর। হিরণ্ময়কে সরাসরি বলা যাবে না। ওঁর মাকে বললে কেমন হয়? ভদ্রমহিলা কয়েকদিন আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে বিবাহিত কিনা। বিবাহিত এবং স্ত্রী ডাক্তার শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। ওর বেশি কিছু সূর্য বলেনি। এখন বলা যায়। যদি মা ছেলেকে কিছু বলে দিতে বলে ছেলে নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না।

'কী ভাবছ?'

'একজনের কথা মনে পড়ছে। তাঁর ছেলে পার্টির বড় কর্তা।'

'কী নাম?'

'হিরণ্ময় সেন।'

'ও ব্বাবা! ওকে বললেই হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে।'

একটু খুশি হয়ে ভেতরে চলে গেল দিশা। সূর্য ভাবল, গিয়েই কথাটা বলবে। এভাবে আর চলছে না। দিশার সমস্যা তো আছেই, ওকে নিয়ে বাড়ির সবাই খুব দুশ্চিন্তায় আছে, কিন্তু এই তৃতীয়বারে আসার সময় সূর্যরও কম সমস্যা হয়নি। একজন পেশেন্ট নার্সিংহোমে ভরতি হয়েছে। কাল অপারেশন হবে। পেশেন্টের আত্মীয়রা চাইছিলেন ডাক্তারবাবু থাকুন। না, সে অপারেশন করবে না কিন্তু ডাক্তারবাবু পাশে আছেন জানলে তারা নাকি খুব স্বস্তি বোধ করবে। আর একজন পেশেন্টের হার্টের অবস্থা ভাল নয়। ওঁর যা বয়স বাইপাশ তো দূরের

কথা অ্যাঞ্জিও করাও সম্ভব নয়। দু'দিন অন্তর ওঁকে দেখতে যেতে হয়। গেলে ভদ্রলোক খুশি হন। ওষুধ একই থাকে, শুধু পাশে বসে দু'-চারটে কথাবার্তা যেন ভদ্রলোককে উজ্জীবিত করে। কলকাতার বাইরে সূর্য চলে যাচ্ছে শুনলে এদের মুখ কালো হয়ে যাবেই। এবার ভেবেছিল এখানে আসাটা কয়েকদিন পিছিয়ে দেবে। এ ছাড়া তৃতীয়বারে আর একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। আগাম টিকিট কাটা, বাসে চেপে সারারাত জার্নি করার কথা ভাবলে মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। কিন্তু এখানে এসে দিশার দেখা পেলে সেসব মিলিয়ে যায়। কিন্তু রওনা হওয়ার আগে ক্লান্তিটা যদি এখনই আসতে আরম্ভ করে তা হলে বাকি তেত্রিশমাসে কী হবে!

'আলো কখন আসবে কে জানে।' দিশা আবার বাইরে এল।

'চলো, একটু হাঁটি।' সূর্য বলল।

'কোথায় হাঁটবে?'

'এমনি। এইমলেস।'

'মাথার ওপর মেঘ ঝুলছে। তোমার তো বৃষ্টিতে একটু ভিজলেই জ্বর আসে। তা ছাড়া রাস্তায় প্যাঁচপেচে কাদা। হ্যাঁ গো, তুমি কাল চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'একটা দিন থেকে যাও না। প্লিজ।'

'ওখানে কী হবে?'

'যা হোক একটা কিছু বলে দিয়ো।'

'না। তা হয় না। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার ওপর খুব ভরসা করেন। একদিন বাদে যদি গিয়ে দেখি উনি নেই তা হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।' সূর্য বলল।

'আশ্চর্য। তিনি তো আজ সকালেও মারা যেতে পারেন!' দিশা অন্যদিকে মুখ ফেরাল, 'পেশেন্ট ছাড়া আর কেউ তোমার ওপর ভরসা করে আছে কিনা জানতে চাও না, না?'

সূর্য তাকাল, 'এসো।'

দিশা তাকাল না, মুখ ফিরিয়ে রইল।

'এখানে এসে বসো।'

দিশা তবু নিরুত্তর।

সূর্য বলল, 'বেশ তা হলে আমি উঠছি। যে আমার ওপর ভরসা করে তাকে জড়িয়ে ধরার লিগ্যাল রাইট আছে সেটা সবাই দেখুক।'

দিশা দ্রুত চেয়ারে এসে বসল। সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এখানে তোমার কেমন লাগছে?'

'ভাল লাগতে পারে? তুমি জিজ্ঞাসা করছ?'

'না। ইমোশনাল প্রব্লেমের কথা বলছি না, এই যে গ্রামের অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করছ—একটা হেল্‌থ সেন্টার তোমার দায়িত্বে আছে। এই কাজটা কেমন লাগছে?'

'প্রথম প্রথম একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এখন ভাল লাগছে। আসলে এখানে তো এদের হেলথ সেন্টার ছাড়া কোনও চিকিৎসার উপায় নেই। ব্লকে যেতেও প্রচুর রাস্তা পেরোতে হবে। এই তিনমাসে আমাকে সবাই ডাক্তারদিদি বলে ডাকতে শুরু করেছে। আমার ক্ষমতা খুব কম। এই দ্যাখো না, মেয়েটাকে সদরে পাঠাতে হল সিজার করাতে হবে বলে। তবু যেটুকু করি তাতেই এরা খুব খুশি। তোমার কাছে একটা ব্যবহার শিখেছি, কখনও কাউকে না বলি না। ফলে আলু, মুলো, কুমড়ো মাঝেমাঝেই কেউ না কেউ পাঠিয়ে দেয়।' দিশা হাসল।

'বাঃ। খুব ভাল। তোমাকে বলেছিলাম তিনমাস কাজ করে দ্যাখো, অভিজ্ঞতা হোক, তারপর খারাপ লাগলে না হয় চাকরি ছেড়ে চলে এসো। এখন কী করবে?' সূর্য তাকাল।

'না। খারাপ লাগছে না এদের সঙ্গে। সত্যি বলতে কী কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি যেন নতুন জন্ম পেয়েছি। অনেক কিছু ভুলে গিয়েছিলাম। সেগুলো বই দেখে আবার ঝালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এটা তো আমার একটা পার্ট, পুরো আমি নই। সেই বাকি অংশটা তো তোমার কাছে থাকতে চাইছে। রাত্রে ঘুম আসে না, এলেও যদি ঘুম ভেঙে যায় তা হলেই কান্না পায়!' ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামাল দিল দিশা।

'তা হলে রেজিগনেশন দাও। কলকাতায় গিয়ে চেষ্টা করলে বসে থাকতে হবে না।' খুব আন্তরিক গলায় কথাগুলো বলল সূর্য।

'না। তার চেয়ে যদি কলকাতার আশেপাশে বদলি নেওয়া যেত তা হলে অন্তত রাত্রে বাড়িতে থাকতে পারতাম। এই গ্রামের মানুষের সঙ্গে সে সব গ্রামের মানুষের কী এমন তফাত। তুমি ভাবতেই পারবে না কলকাতার পেশেন্টদের চেয়ে এরা কত অসহায়। এদের ছেড়ে যাওয়া মানে নিজের হার মেনে নেওয়া। এখানে যদি না আসতাম অথবা এসেই যদি ফিরে যেতাম তা হলে আমার এই রিয়েলাইজেশন হত না। আবার তোমাকে ছাড়াও আমি থাকতে পারছি না।' দিশা আবার সূর্যর দিকে তাকাল, 'তুমি হিরণ্ময়বাবুকে বলবে তো?'

'বলব।'

'খবরের কাগজের নামকরা রিপোর্টার, ও হ্যাঁ, তুমি বন্দনাকে বলতে পারো।'

'বন্দনা?'

'বন্দনা দত্ত। ভাল গান গাইত, আমাদের সঙ্গে পড়ত।'

'ও হ্যাঁ। কিন্তু ও তো ডাক্তার। দিল্লি চলে গেছে।'

'হ্যাঁ। ওর বড়দা খুব বড় রিপোর্টার। মন্ত্রীরা সবাই তাঁকে চেনে। তুমি বন্দনার পরিচয় দিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারো।' যেন বাতিঘর দেখাচ্ছে এমন গলায় বলল দিশা।

হেসে ফেলল সূর্য, 'সেটা কি ভাল দেখাবে? তার চেয়ে তুমি তো কয়েকদিন পরে কলকাতায় যাবে, বন্দনার বান্ধবী হিসেবে তুমি যদি তোমারই সমস্যা নিয়ে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে কথা বলো তা হলে উনি মন দিয়ে শুনবেন, দেখতেও ভাল লাগবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমারই মাথার ঠিক নেই।' দিশা সমর্থন করল।

'আবার বৃষ্টি আসছে।'

'ভাগ্যিস, নইলে গরমে টিকতে পারতে না। জানো, যশোমতীর মা আমাকে কী বলেছিল?'

সূর্য তাকাল।

দিশা হাসল, 'এ কি ডাক্তারদিদি, তোমার বর সেখানে আছে আর তুমি এখানে, তা হলে বিয়ে করলে কেন? তোমাদের দু'জনের সংসার হবে না?'

'তুমি কী বলেছ?'

'হবে। আমি যখন বদলি হয়ে ওখানে চলে যাব, তখন হবে। তা শুনে ও বলেছিল, তার চেয়ে জামাইকে বলো এখানে চলে আসতে। তিনিও তো ডাক্তার। দু'জনে মিলে গ্রামের মানুষের চিকিৎসা করো, তোমাদের থাকা-খাওয়ার অভাব হবে না।'

'খুব ভাল প্রস্তাব। আসব?' সূর্য জিজ্ঞাসা করল।

'ধ্যেৎ।'

'কিন্তু ওর কথায় যুক্তি আছে দিশা। বিবাহিত হয়েও আমরা আলাদা আছি। কেন?'

'কিছুটা কর্তব্যের জন্যে, কিছুটা টাকার জন্যে।'

'কর্তব্য তুমি কলকাতায় বাড়িতে থেকেও করতে পারো। কোনও পল্লীমঙ্গল বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দিনরাত পেশেন্ট দেখে কর্তব্য করা কাকে বলে

দেখিয়ে দিতে পারো। মূলত টাকা এবং অভিজ্ঞতা। সংসারের জন্যে যতটা না টাকার দরকার তোমার আত্মনির্ভর হওয়ার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকার দরকার। সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতাও বাড়ছে।'

সূর্যর কথা শেষ হওয়া মাত্র আলো জ্বলে উঠল। সূর্য ঘড়ি দেখল, 'সাড়ে তিনটে। এখন একটা ভাত-ঘুম হবে নাকি?'

'ভাত কখন হজম হয়ে গিয়েছে। এখন ঘুমালে আমার শরীর খারাপ হবে। তুমি টায়ার্ড, তুমি ঘুমাতে পারো।'

'তোমাকে পাশবালিশ করে না শুলে আমার ঘুমিয়ে আরাম হবে না।'

ঠিক তখনই গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। দিশা উদ্বিগ্ন হল, ট্যাক্সিটা ফিরে এল নাকি? সদর থেকে তো এত তাড়াতাড়ি ফেরা সম্ভব নয়!

সূর্য আশ্বস্ত করল, 'না সেই গাড়িটা নয়, একটা জিপ আসছে।'

'সর্বনাশ।'

'কেন? জিপের সঙ্গে সর্বনাশের কী সম্পর্ক?'

'ডক্টর শান্ত চৌধুরী। সাব ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার।'

'আচ্ছা! দুপুরে নাম করতেই বিকেলে হাজির। একেই বলে টেলিপ্যাথি।'

'চুপ করো!' দিশা উঠে দাঁড়াল, 'এবার নিশ্চয়ই আমার ডাক পড়বে।'

'উনি যখন এসেছেন তখন তো তোমাকে যেতেই হবে।'

'আর অন্য কোনও দিন আসার সময় পেলেন না। অদ্ভুত।'

সূর্য দেখল জিপটা হেলথ সেন্টারের দিকে না গিয়ে এদিকে আসছে। সে চাপা গলায় বলল, 'তোমাকে যেতে হচ্ছে না, তিনি নিজেই আসছেন।'

জিপ থামল সামনে। বৃষ্টি পড়ছিল। ভদ্রলোক একটা ছাতা নিয়ে দৌড়ে চলে এলেন বারান্দায়। দিশা এগিয়ে গেল, 'আসুন স্যার!'

'একটু বিরক্ত করছি বোধহয়।' ভদ্রলোক রুমালে মাথা মুছলেন।

'না না। আপনাকে এ সময় এখানে ভাবতে পারিনি। এই ওয়েদার।' খালি চেয়ারটা দিশা এগিয়ে দিল। ডক্টর চৌধুরী বললেন, 'আপনাদের পাশের গ্রামে আসার প্রয়োজন হয়েছিল। ভাবলাম আপনার চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে যাই, পারলে দিয়ে আসব।'

'কী চিঠি?'

'গাড়িতে আমার অ্যাটাচিটা আছে।' বলে গলা তুলে ড্রাইভারকে অ্যাটাচি দিয়ে যেতে বললেন।

ড্রাইভার দ্রুত সেটা পৌঁছে দিয়ে গেলে বোতাম টিপলেন ডক্টর চৌধুরী।

অ্যাটাচি খুলে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিলেন। দিশা সেটা নিল। নিয়ে তাকাল।

'ও হো আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি। আমার স্বামী সূর্য, ও ডাক্তার।'

'আচ্ছা। হ্যাঁ, স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ডাক্তার। তা হলে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে ভাই। আপনি কেন সরকারি চাকরিতে জয়েন করলেন না?' ডক্টর চৌধুরী মাথা দোলালেন।

'তা হলে কী সুবিধে হত?' সূর্য জিজ্ঞাসা করল।

'ওঁকে একা থাকতে হত না। সরকারি আইনে স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ডাক্তার হিসেবে জয়েন করলে মোটামুটি একই এলাকায় দু'জনকে রাখা হবে। সে ক্ষেত্রে আপনারা একসঙ্গে থাকতে পারতেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আপনাকে এত দূরে আসতে হত না।' ডক্টর চৌধুরী বললেন।

দিশা বলল, 'উনি স্বাধীনতা চান। তাই চাকরি না করে প্র্যাকটিস করছেন।' কথাগুলো বলে দিশা খাম খুলল। খুলেই বলল, 'সর্বনাশ।'

সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

'ট্রান্সফার করা হয়েছে আমাকে। ব্লক হেলথ সেন্টারে।'

'কত দূরে?'

'ওই যে হাইওয়ে, যেখানে তুমি নামলে তার কাছেই।'

'বাঃ ভাল। তুমি সর্বনাশ বলছ কেন?'

'এখানে বেশ ছিলাম। কোনও ঝামেলা নেই। আবার একটা নতুন জায়গায় যেতে হবে। এখানে যশোমতী ছিল, খুব ভাল মেয়ে। তা ছাড়া—।' থামল দিশা।

'তা ছাড়া কী?' সূর্য বুঝতে পারছিল না সমস্যাটা।

'না স্যারের সামনে বলব না।'

ডক্টর চৌধুরী বললেন, 'নো প্রব্লেম। সরকারি আইনে প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে মহিলাদের পোস্ট করা হয় না। এখানে ছেলেরাই আসেন। আপনার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছিল আর ভুলটা তাড়াতাড়ি সংশোধন করা হল। ব্লকের মহিলা ডাক্তার ট্রান্সফারের জন্যে চেষ্টা করছিলেন অনেকদিন থেকে। ওঁর বাড়ি নদিয়ায়। পেয়ে গেছেন। তাঁর জায়গায় আপনি যাবেন। আমার তো মনে হয় এতে আপনার সুবিধে হল।'

'সুবিধে?'

'নিশ্চয়ই। আসার সময় রাস্তার যা হাল দেখলাম—! অন্তত এই রাস্তায় তো যাওয়া আসা করতে হবে না। পাঁচ মিনিট হাঁটলেই বাসস্ট্যান্ড। তা ছাড়া ওখানে

আমারবই.কম

কাজের অনেক সুবিধে। আপনি ছাড়া আর একজন সিনিয়ার ডাক্তার আছেন যাঁর ওপরে ব্লকের দায়িত্ব। একজন আয়ুর্বেদিক আছেন। তিনজন নার্স, অফিস ক্লার্ক ইত্যাদি থাকায় পেশেন্টদের বেশি কেয়ার নিতে পারবেন।' ডক্টর চৌধুরী বললেন।

'থাকার জায়গা?'

'দুটো বেডরুমের বাড়ি পাবেন। ফার্নিচারও আছে। দু'-একটা সস্তা জিনিস কিনতে হতে পারে। বাজার-টাজার, স্পেশ্যালি মাছ ওখানে সহজে পাওয়া যায়। আচ্ছা, এবার উঠি।' ডক্টর চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন।

'না স্যার। আপনি যদি চা না খেয়ে যান তা হলে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

'চা? আচ্ছা, একটু তাড়াতাড়ি।' ডক্টর চৌধুরী আবার বসতেই দিশা ভেতরে চলে গেল। সূর্য কথা বলার জন্যেই কথা বলল, 'আচ্ছা, ব্লকে কি অপারেশন হচ্ছে?'

'না। ও টি নেই। কোনও বড় ফোঁড়া নিয়ে কেউ এলে ওরা বাধ্য হন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে। আবার আমার সাবডিভিশনাল হসপিটালেও অনেক লিমিটেশন। কোনও পেশেন্টের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বুঝলেও চিকিৎসা শুরু করতে পারি না। ইসিজি মেশিন যেটা ছিল সেটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। অনেক দিনেও সারাতে পারিনি। হয় পেশেন্টকে বাইরে থেকে ইসিজি করিয়ে আনতে হয়, নয় তাকে সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই। আমি এখন বিশ্বাস করি এই পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতাল বা হেলথ সেন্টারগুলোতে যে চিকিৎসা চলছে তা চিকিৎসকদের আন্তরিকতার জন্যে। অনেক টাকা ঢেলেছে স্বাস্থ্য দফতর কিন্তু যুদ্ধ করার অস্ত্রগুলো কোনও বিশেষ কারণে যোদ্ধাদের হাতে গিয়ে পৌঁছোয়নি।' ডক্টর চৌধুরী বললেন।

'আপনি কি এই অঞ্চলের লোক?'

'না না। আমার ঠাকুর্দা হাওড়া থেকে গিয়ে শান্তিনিকেতনে বাড়ি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের খুব কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। বাবা ওখানেই পড়েছেন, পড়িয়েছেন। আমার স্কুল ওখানে। আমি এই চাকরি নিয়ে সারা বাংলা ঘুরে বেড়াচ্ছি। এবার অবসর নেওয়ার সময় হল, ভাবতে পারছি না কোথায় যাব?'

'কেন? শান্তিনিকেতনের বাড়ি?'

'নেই। কেউ থাকছে না, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই দাদা বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় সেটলড্ হয়েছেন।' ডক্টর চৌধুরীর কথা শেষ হতেই দিশা একটা বড় থালায় দু' কাপ চা নিয়ে এল, 'আমার এখানে টে নেই, কিছু মনে করবেন না।'

'টের বিকল্প তো আছে।'

সূর্য চায়ের কাপ নিয়ে বলল, 'ছেলেবেলায় শান্তিনিকেতনে খুব যেতাম।'

'বেড়াতে?' ডক্টর চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ। আমার দাদুর বাড়ি ছিল সেখানে। মা ওখানেই পড়াশুনা করেছেন। মামা নেই বলে আমরা দাদুর বাড়ি বলতাম।'

'শান্তিনিকেতনের কোথায় বাড়ি?' চায়ে চুমুক দিলেন ডক্টর চৌধুরী।

'পূর্ব পল্লীতে। দাদু ভাড়া নিয়ে থাকতেন।'

'কী নাম ওঁর?'

'হরপ্রসাদ লাহিড়ি। মারা গিয়েছেন।'

ডক্টর চৌধুরী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। সেটা লক্ষ করল দিশা। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি চিনতেন ওঁকে?'

'অ্যাঁ? ও, ছোট জায়গা তো, সবাই সবাইকে চিনতাম। আচ্ছা, এবার চলি।' চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ডক্টর চৌধুরী রুমাল বের করলেন। ড্রাইভারকে ইশারা করলেন দরজাটা খুলতে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে যেসব জিনিসপত্র ওখানে যাবে সেগুলো কীসে নিয়ে যাবেন?'

'একটা ট্যাক্সি আছে, তাতেই হয়ে যাবে।'

'তা হলে পরশু চলে আসুন। আপনার জায়গায় যিনি এখানে আসছেন তিনি পরশু জয়েন করবেন।' বলেই হেসে ফেললেন ভদ্রলোক।

'কী হল স্যার?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।

'এ সব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর জন্যে আমার অফিস আছে। অথচ আমি কী চমৎকার এই নিয়ে কথা বলছি। আচ্ছা, চলি ডক্টর।' সূর্যকে নমস্কার জানিয়ে দৌড়ে উঠে গেলেন জিপে। বৃষ্টির মধ্যে সেটা চোখের আড়ালে চলে গেল।

চায়ের কাপ শেষ করে সূর্য দেখল মেঘের আড়াল থাকায় দিনটার শেষ হয়ে আসা বোঝা যায়নি। সে মুখ ফেরাল, 'চা খাবে না?'

'নাঃ।'

'হঠাৎ?'

'ইলিশ খেয়ে পেটটা ভার হয়ে আছে,' দিশা বলল, 'এখানকার পাট উঠল।'

'হ্যাঁ। ভালই হল। বাস থেকে নেমে এত ধকল সইতে হবে না।'

'আমি সত্যি অবাক হয়ে গেছি। আমার চিঠি ওঁর আনার কথা নয়। আমি শুনেছি উনি প্রটোকল মানেন না, তবু—।'

'মানুষটা ভাল বলেই মনে হল। ওঁর স্ত্রী এখানেই থাকেন?'

'না না। উনি ব্যাচেলার। এ নিয়ে ওঁর খুব গর্ব আছে।' দিশা বলল, 'এখানে বেশ ছিলাম। ওখানে মাথার ওপর একজন ডাক্তার থাকবেন। লোকটা কেমন কাঠখোট্টা।'

'দেখেছ?'

'দেখিনি? মাঝে মাঝেই তো এখানে ভিজিট করে।'

'কাঠখোট্টা লোকদের সঙ্গে কাজ করার একটা সুবিধে আছে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলান না তাঁরা। এই তুমি একবার ঢুঁ মারতে যাবে না?'

'যাব। কিন্তু তুমি একা বসে থাকবে?'

'থাকব। বসে বসে গান গাইব।'

'নাঃ, একটা টিভি আনতেই হবে।'

'রক্ষে করো। তোমার সেই টু-ইন ওয়ানটা দিয়ে যাও। কলকাতায় তো রেডিয়ো শোনা হয় না। গ্রামে বসে পল্লীমঙ্গলের আসর শুনি।'

টু-ইন ওয়ান দিয়ে ছাতি মাথায় দিশা চলে গেল হেল্‌থ সেন্টারে। নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্টেশন ধরার চেষ্টা করতে শুধু বিকট আওয়াজ শুনতে পেল সে। হঠাৎ যশোমতীর হাসির আওয়াজ কানে আসতেই চোখ ফেরাল সূর্য। মেয়েটা চায়ের কাপ নিয়ে যেতে এসে কাণ্ড দেখে হাসল।

'এটা চলে?' সূর্য জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। ব্যাটারি ডাউন বলে শব্দ হচ্ছে।' বলে ভেতরে নিয়ে একটা লম্বা ইলেকট্রিকের তার এনে দিল মেয়েটা।

'গুড।' যন্ত্রে একটা মুখ ঢুকিয়ে অন্য মুখটা পয়েন্টে গুঁজে দিতে শব্দ হল। নব ঘোরাতেই কানে এল,

'সজল সন্ধ্যায় তুমি এসেছিলে, সখী,
একটি কেতকী
তখনও হয়নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ চিরে মেঘের গর্জন আর সেটার সঙ্গে চমৎকার সঙ্গত করল রেডিয়োটা। যশোমতী চেঁচিয়ে উঠল, 'বন্ধ করে দিন, বন্ধ করে দিন, পুড়ে যাবে।'

'কী পুড়ে যাবে?' সূর্য অবাক।

'রেডিয়োটা। বাজ পড়ছে।'

রেডিয়ো বন্ধ করল সূর্য। মেয়েটা চলে গেলে ভাবতে চাইল পরের

লাইনগুলো। কী ছিল? মাথায় কিছুতেই আসছে না। পেটে আসছে, গুলিয়ে যাচ্ছে। কবিতাটার নাম কী যেন? পরিচয়। হ্যাঁ, পরিচয়। মাঝখানের লাইন ওগুলো। বাইরে তাকাল সে। অন্ধকার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আলো জ্বলে উঠেছে ঘরে। তার কিছুটা এসে পড়েছে বারান্দায়। হঠাৎ সে দেখল দিশা ফিরে আসছে। দ্রুত। হঠাৎই দুটো লাইন চলকে উঠল মনে, 'পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারি বিন্দুপাত/গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত।' আবৃত্তি করল সূর্য। করে হাত বাড়াল। বারান্দায় উঠে এসে দিশা সেই হাত ধরল, 'আজ আমার ছুটি।'

সন্ধেটা চমৎকার কাটছিল, গোল বাধাল যশোমতী। দিশার বদলির কথা শুনে প্রথমে তার মুখ হাঁড়ি, শেষে কেঁদেই ফেলল। দিশা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, 'আমার চাকরিটাই তো এমন কী করব বল। আমার জায়গায় যে আসবে সে নিশ্চয়ই তোকে রাখবে। আমি নাহয় বলে যাব।'

'সে তো ব্যাটাছেলে।' কাঁদতে কাঁদতে বলল যশোমতী।

সূর্য দৃশ্যটা দেখছিল। না বলে পারল না, 'সর্বনাশ। ও জানল কী করে?'

'শুনেছি। ওই সাহেব বলে গেল।' কান্না তখনও ওকে ছাড়ছে না।

দিশা মুগ্ধ হল। 'বুঝলাম। হ্যাঁরে, আমি চলে গেলে তোর খুব কষ্ট হবে?'

'হ্যাঁ, হবে। অর্ধেক।'

'অর্ধেক? তার মানে?'

'তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।'

'এখান থেকে কত দূর। হেঁটে যাওয়া আসা করতে পারবি না। তোর মা ছাড়বে?'

'ছাড়বে। তোমার কাছে থাকলে ছাড়বে। আমি রবিবারে এসে দেখে যাব।' যশোমতী বলল।

সূর্য বলল, 'এখান থেকে বেশি দূরে তো নয়। ও থাকলে তোমার সুবিধেই হবে। কিন্তু যশোমতী, তোমার দিদির জন্যে অর্ধেক মন খারাপ হয়েছে, বাকিটা হয়নি কেন?'

'তাও হয়েছে।'

'সেটা কার জন্যে?'

মেঝের দিকে তাকাল যশোমতী, 'দিদি চলে গেলে আমি আর ভাল খেতে পারব না।'

হকচকিয়ে গেল সূর্য। দেখল দিশাও তার দিকে তাকিয়ে। এ রকম উত্তর ওরা

আমারবই.কম

কেউ আশা করেনি। কোনওরকমে দিশা বলল, 'তুই যা। রাত করিস না, খেয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যা। আমি কাল তোর মায়ের সঙ্গে কথা বলব।' যশোমতী সরে গেল সামনে থেকে।

সূর্য বলল, 'ভাবা যায়?'

'যায় না। কলকাতায় আমি ভাবতে পারতাম না। যখন কোনও পেশেন্টকে বলি এবার তোমার একটু ভাল খাওয়া দরকার। ভিটামিনের প্রয়োজন। তখন সে বলে, ভাল খাবার মানে? তাকে বুঝিয়ে বলতে সে মাথা নাড়ে। মাছ মাংস ডিম খাওয়ার সামর্থ্য অনেকের নেই। আপেল বা কলা খাওয়াও এদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও জোগাড় করে তা হলেও খেতে পারে না।' দিশা বলে।

'কেন?'

'বাচ্চাদের চোখের সামনে মা কী করে ওগুলো মুখে দেবে?'

'হুঁ। কিন্তু যশোমতী তোমার কাছে আছে বলে রোজ ভালমন্দ খাচ্ছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে গিয়ে ভাই-বোন মা-বাবাকে যা খেতে দেখছে তাতে ওর মন খারাপ হয় না?'

'আমি জানি না। তবে অভাব তো মানুষকে স্বার্থপর করে দেয়।' দিশা বলল, 'এই ক'দিন মেয়েটা এখানে আছে, জামাটা আমিই কিনে দিয়েছি, এরই মধ্যে চেহারায় দারুণ পরিবর্তন এসে গেছে। কী রকম চকচকে ভাব। ওর ভাইবোনের সঙ্গে বিরাট তফাত হয়ে গেছে। যাকগে, তুমি এখন খাবে?' দিশা খাটে এসে বসল।

'এখন? ক'টা বাজে? মাত্র আটটা দশ।'

'বিকেলে তো কিছু খাওনি?'

'খিদেই পায়নি। কলকাতায় খেতে খেতে রাত বারোটা বেজে যায়।'

'এখানে কিন্তু তখন নিশুতি রাত।'

সূর্য উঠল। রেডিয়োটা চালাল। শ্যামাসংগীত হচ্ছে। নব ঘোরাল, কেউ কোনও বিষয় নিয়ে খুব সিরিয়াস কথাবার্তা বলছে। শেষ পর্যন্ত হিন্দি গান কানে এল। সুরটা খুব মিষ্টি। দিশা বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, চেঞ্জ কোরো না।' আমার প্রেমিক আসবে, বসন্ত তুমি ফুল ছড়িয়ে দাও। গান শেষ হলে সূর্য বলল, 'হিন্দিতে অনেক কথা কী সহজে বলা যায়, বাংলায় বললে হাস্যকর বলে মনে হয়। অথচ বাংলা হিন্দির থেকে অনেক ধনী ভাষা।'

'ধনী বলেই বোধহয় মাটির সঙ্গে মিশতে অসুবিধে হয়।' দিশা হাসল। সূর্য ততক্ষণে রেডিয়ো বন্ধ করে বাবু হয়ে বসল, 'আচ্ছা, দিশা, আমরা এভাবে

কতদিন আলাদা থাকব?'

'তিনবছরের পর বদলি হওয়ার নিয়ম। তুমি তো কথা দিয়েছ কলকাতায় গিয়ে চেষ্টা করবে, কাছাকাছি কোথাও পোস্টিং হয় তার চেষ্টা করবে।' দিশা বলল।

'কিন্তু যদি তা না হয়?'

দিশা থমকে গেল। চুপচাপ তাকাল।

সূর্য সেটা দেখে হেসে ফেলল। বলল, 'যা হয় হবে। এখন এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। একটা গান শোনাবে?'

'দূর! ওসব ভুলে গেছি। তা ছাড়া আমি কি কখনও গান শিখেছি?'

'কলেজে তো গাইতে?'

'তখন বয়স কম থাকায় সাহস ছিল।'

খেয়েদেয়ে যশোমতী চলে গেলে দিশা একটু জোর করেই সূর্যকে খেতে রাজি করাল। এঁটো বাসন কাল সকালের জন্যে রেখে ভাল করে জানলা দরজা বন্ধ করে শোওয়ার ঘরে এল সে। আর তখনই টুপ করে আলো নিভে গেল।

'আঃ!' দিশার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'খুব কষ্ট হবে না। আজ গরম নেই, ঠান্ডা হাওয়া বইছে।' সূর্য বলল।

মশারি ফেলল দিশা। মাথার ওপর ফ্রেমে আটকানো থাকে। তার প্রান্ত বিছানার নীচে গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'মশারির মধ্যে একটু পরেই গরম লাগবে, দেখো।'

'মশারি টাঙাতেই হবে?'

'আর একটু পরে বসতে পারবে না। আজ সারাদিন বৃষ্টি বলে বুঝতে পারছ না।'

বিছানার মাঝখানে চলে আসতেই সূর্য দিশাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর শব্দ করে চুমু খেল। দিশা ধমকাল, 'আহ, কী হচ্ছে?'

'আ আলজিভ চুম্বন কর, শব্দ হোক, ফাটুক ব্রহ্মাণ্ড।'

'বাঃ! মরে যাই আর কী।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে শরীরে জোয়ার। একেবারে খাদের কিনারায় পৌঁছে সরে দাঁড়াতে চাইল দিশা, 'এই, না। প্লিজ।'

'কেন?'

'তুমি কিছু নিয়ে আসনি?'

'একদম ভুলে গিয়েছি।'

'অদ্ভুত। এটাও মনে থাকে না?'

'সকালেও মনে ছিল। পেশেন্ট দেখতে দেখতে—।'

'তা হলে এবার থাক।'

'দূর! থাকবে কী? কতদিন পরে।'

'তুমি পাগল হয়ে গেলে? এখন আমি কনসিভ করতে পারব না।'

'সেটা তো নাও করতে পার?'

'ডাক্তার হয়ে তুমি এমন কথা বলছ?' দিশা বলল, 'আমি আমার সময়টা জানি।'

ছিটকে সরে গেল সূর্য। ততক্ষণে অন্ধকার চোখ সওয়া হয়ে গেছে। সূর্যর শোওয়ার ভঙ্গি দেখে কী রকম মায়া লাগল দিশার। গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এসো।'

'যদি কনসিভ করো?'

'ক'মাসের ছুটি তো পাব।'

'তারপর? বাচ্চাটা!'

'মাস তিনেকের হলে নিয়ে আসব এখানে।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ। আমার বাচ্চাকে আমি বড় করব।'

'এই পাণ্ডববর্জিত গ্রামে? একা? চাকরি করে পারবে?'

'দ্যাখো আমি তো দশটা-পাঁচটা চাকরি করছি না। যখন ইচ্ছে হেলথ সেন্টার থেকে বাড়িতে চলে আসতে পারি। আর ডিউটি তো বেশি সময়ের জন্যে নয়। তা ছাড়া যশোমতী তো থাকছেই। তেমন বুঝলে দুই মাকে বলব পালা করে এসে থাকতে।' দিশা হাসল।

'যদি অসুখ হয়, যদি অক্সিজেনের দরকার হয়?'

'হবে না। আমি ওর অসুখ হতে দেব না।'

'আর আমি?'

'তুমি মানে?'

'আমি তো ওর বাবা হব! তাই না।'

'আর কী হবে? আশ্চর্য।'

'আমি রাত্রে বাড়ি ফিরে ওকে দেখতে পারব না, সকালে উঠে ওকে আদর

করতে পারব না। অসম্ভব! এটা আমি সহ্য করতে পারব না। ও এখন নেই সেটা ঠিক আছে, ও যদি আসে তা হলে ওকে দেখতে চাই।' সূর্য জোর দিয়ে বলল।

'তুমি বুঝতে পারছ না কেন, মা ছাড়া যে সব বাচ্চা বড় হয় তাদের একটা অভাব চিরকাল থেকে যায়। কোনও কিছুর বিনিময়ে তা পূর্ণ হয় না।' দিশা বলল।

'তোমার শরীর খারাপ হলে ওকে কে দেখবে? পাগলামি। যাও শুয়ে পড়ো।'

'এই রাগ করেছ?'

'নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। আসবার সময় বেমালুম ভুলে গেলাম? আসলে যে ওষুধের দোকানে দুপুরে বসেছিলাম সেখান থেকে কিনতে কেমন লজ্জা করল। ওদের তো বলেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তারপর যদি ওই বস্তু কিনি তা হলে যে হাসাহাসি হবে সেটা আমার পছন্দ হল না। আবার অন্য দোকান থেকে কেনার কথা ভুলে গেলাম।' বলতে বলতে সূর্যর মাথায় মতলব এল, 'এই একটা কাজ করো।'

'কী কাজ?'

'তোমাদের হেলথ সেন্টারে নিশ্চয়ই ওই ধরনের বস্তু প্রচুর পরিমাণে আছে!'

'হ্যাঁ আছে। তবে খুব ভাল কোয়ালিটি নয়।'

'নাই হোক। ভিখিরির পছন্দ করার অধিকার নেই।' সূর্য বলল, 'যাও, নিয়ে এসো।'

'কী?' চিৎকার করে উঠল দিশা।

'আরে চেঁচাচ্ছ কেন?'

'তুমি আমাকে এই রাত্রে হেলথ সেন্টারে যেতে বলছ ওটা আনতে?'

'সরকার তো হেলথ সেন্টারকে এই কাজের জন্যে বিতরণ করতে বলেছেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা আউটডোরের নির্দিষ্ট সময়ে। তা ছাড়া ওগুলো যার কাছে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে থাকে তাকে আমি পাব কোথা? সে তো ঘুমাচ্ছে।'

'কতদূরে সে থাকে?'

'ওপাশের কোয়ার্টার্স।'

'তা হলে গিয়ে দ্যাখো না জেগে আছে কিনা। এমন তো হতে পারে জেগে আছে। তখন তার কাছে একটা ওষুধ নেবে বলে চাবি চেয়ে নিয়ো।'

'আমি ওষুধ চাই বললে সে নিজে ছুটে গিয়ে বের করে দেবে। ওকে নিশ্চয়ই আমি সত্যি কথাটা বলতে পারব না।' দিশা মাথা নাড়ল।

'এখন হেলথ সেন্টারে কে কে আছে?'

আমারবই.কম

'নার্স, হেলপার, কেন?'

'দ্যাখো না নিয়ে, হয়তো আলমারিতে চাবি দেওয়া নেই।'

'তুমি আমাকে এই লোডশেডিং-এর মধ্যে যেতে বলছ?'

'ওঃ তাই তো! সত্যি, আলো যাওয়ার আর সময় পেল না। টর্চ নেই?'

জিজ্ঞাসা করা মাত্র আলো জ্বলে উঠল। বিছানায় ওঠার সময় সুইচ অফ করতে ভুলে গিয়েছিল দিশা, দ্রুত গায়ে কাপড় জড়িয়ে নিল।

সূর্য বলল, 'ঈশ্বর তুমি সত্যি করুণাময়। দ্যাখো, তিনি আলো জ্বেলে দিলেন। এখন তুমি যদি একটু কষ্ট কর, আরে কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে?'

লজ্জা পাচ্ছিল দিশা। বিড় বিড় করে কিছু বলল। তারপর যেন বাধ্য হয়ে বিছানা থেকে নামল। দ্রুত পোশাক বদলে চুলে চিরুনি চালিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে আর মান সম্মান রইল না।'

সূর্য বলল, 'লজ্জা ঘেন্না ভয় তিন থাকতে নয়।'

দিশা যখন দরজার দিকে এগোচ্ছে তখনই বাইরে থেকে শব্দ হল। কেউ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। দিশা চমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'দিদি, একটু দরজা খুলুন।' নার্সদের একজনের গলা।

দরজা খুলল সে। আলো পড়ল বাইরে। মেয়েটির নাম নমিতা, উত্তেজিত হয়ে বলল, 'একজন পেশেন্ট এসেছে। পা দিয়ে খুব রক্ত পড়ছে।'

'কে?' দিশা গম্ভীর হল।

'চিনি না। এই গ্রামের কেউ না।'

'কী করে এল?'

'সাইকেল চালিয়ে আর একজন নিয়ে এসেছে।'

'চলো, দেখছি।'

বৃষ্টি বন্ধ। আকাশের তারাদের অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। পিছলে পড়ার ভয়ে সাবধানে রাস্তাটা হেঁটে এল দিশা। হেলথ সেন্টারের বারান্দার একপাশে একটা সাইকেল দাঁড় করানো। আউটডোরের একমাত্র খাটে যে শুয়ে আছে তার গলা থেকে গোঙানি বেরুচ্ছে। মাথার পাশে আর একটি যুবক দাঁড়িয়ে তাকে আশ্বস্ত করছিল।

দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

'ওর পায়ে একটা গুলি লেগেছে। বুলেটটা বোধহয় ভেতরে আছে। দয়া করে বের করে দিন তাড়াতাড়ি। অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে।' সঙ্গী ছেলেটি বলল।

'কিন্তু এটা তো পুলিশকে জানাতে হবে। না জানিয়ে আমরা কিছু করতে পারি

না।' দিশা বিব্রত গলায় বলল।

'পুলিশকে জানাবার সুযোগ কাল সকালের আগে তো পাচ্ছেন না। ততক্ষণ ওর প্রাণ নাও থাকতে পারে। তাই না?' ছেলেটি বেশ জোরের সঙ্গে বলল।

দিশা এগিয়ে গেল। ছেলেটির পরনে ফুল প্যান্ট। তার একটা জায়গা ফুটো এবং থাইয়ের নীচের প্যান্ট রক্তে চপচপ করছে।

নার্সের কাছ থেকে একটা কাঁচি চেয়ে নিয়ে প্যান্টটা কাটল দিশা। পা সরাবার সময় ছেলেটি আর্তনাদ করে উঠল। এবার ক্ষতটা দেখা গেল। অনেকটা ভেতরে বুলেট বিঁধে থাকতে পারে কারণ অন্য পাশ দিয়ে সেটা বের হয়নি।

'কখন হয়েছে?'

'বিকেল চারটে নাগাদ।'

'এতক্ষণ ডাক্তার দেখাননি কেন? পচে যেতে পারে।'

'ডাক্তার পাওয়া গেলে আপনার কাছে আসতাম না।'

'দেখুন, এই হেলথ সেন্টারে কোনওরকম অপারেশন করা যায় না। আপনি ওকে এখনই ডিভিশনাল হাসপাতালে নিয়ে যান।'

'আপনি ওকে মেরে ফেলতে বলছেন ডাক্তার।'

দিশা ছেলেটির দিকে তাকাল। ছেলেটির চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। এরা কারা? ডাকাত? ডাকাত হলে পুলিশের কাছে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে। কিন্তু কোনও ডাকাত কি এ রকম শিক্ষিত গলায় কথা বলে? এইসময় শায়িত ছেলেটি চিৎকার করল, 'মা, মাগো!'

দিশা দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটিকে বলল, 'আপনি বাইরে যান।'

'কেন?'

'আমি আপনাকে দেখিনি। এই আহত ছেলেটি কীভাবে হেলথ সেন্টারে এসেছিল তাও আমি জানি না। কিন্তু ওর যা অবস্থা তাতে আমাকে মানবিকতার কারণে চেষ্টা করতে হয়েছিল বুলেট বের করতে। কাল পুলিশকে আমি এইরকম কথা বলব। অবশ্য নমিতা যদি আমার সঙ্গে একমত হয়।' দিশা ঘুরে দাঁড়াল।

'দিদি, আপনি ওকে বাঁচান। আমিও একই কথা বলব।'

'তুমি এদের চেনো?'

'না দিদি। কখনই দেখিনি।' নমিতা বলল।

ছেলেটি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফোড়া কাটার জন্যে যেসব ছুরি ছিল তার একটা আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করা হল। তারপর স্যাভলনে ধুয়ে গ্লাভস পরে নিল দিশা। একটা চিমটি জাতীয় কিছু

আমারবই.কম

চাই। হাসপাতালে সেটা নেই। নমিতা একটা বড় শল্লা জোগাড় করে আনল। সেটাকেও শুদ্ধ করে ক্ষতের ওপর প্রতিষেধক ঢেলে দিল খানিকটা।

এখন উচিত ইঞ্জেকশন দিয়ে জায়গাটাকে অসাড় করে অপারেশন করা। কিন্তু সেই ইঞ্জেকশন এখানে নেই। দিশা বলল, 'এই যে ভাই, একটু ব্যথা লাগবে, সহ্য করতে হবে, কোনও উপায় নেই।'

'আমি, আমি—।' এই প্রথম কথা বলল ছেলেটি।

'আপনার নাম কী?'

'নগেন্দ্র, নগেন্দ্র—।'

সঙ্গে সঙ্গে ছুরি দিয়ে ক্ষতের মুখটা অনেকটা চিরে দিল দিশা। অদ্ভুত ব্যাপার, রক্ত যতটা বেরিয়ে আসা উচিত ততটা বের হল না। তারপর আঙুল ঢোকাল গর্তে। ছেলেটি তখন পরিত্রাহি চিৎকার করছে। একবার শিকবিদ্ধ শুয়োরকে এ রকম চিৎকার করতে শুনেছিল দিশা।

এবার আঙুলের ডগায় শক্ত ধাতব কিছুর স্পর্শ পেতেই আঙুল সরিয়ে শল্লা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। মিনিট দুয়েক চেষ্টার পরে শল্লার মুখ বের করে নিয়ে এল বুলেটের অহংকারকে। সেটা ট্রের ওপর ফেলে দিয়ে অনেকটা প্রতিষেধক ভেতরে ঢুকিয়ে গজ পুরে দিল সে। তারপর ভাল করে ব্যান্ডেজ করে নমিতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'স্টোরের চাবি কি এখানে আছে?'

'হ্যাঁ, সন্ধেবেলায় একটা ডেলিভারি কেস এসেছে, এখনও হয়নি, তাই নিয়ে রেখেছিলাম। কিছু আনতে হবে?'

'আপাতত একটা অ্যান্টিটিটেনাস নিয়ে এসো।'

ডিসপজেবল সিরিঞ্জ আর ওষুধ নিয়ে ফিরে এল নমিতা। ছেলেটার হাতে ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল দিশা। এখন কেমন আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে ছেলেটা। গোঙানি আর নেই। তবে ব্যান্ডেজটায় এবার রক্ত ফুটে উঠেছে।

এখনই একটা পেইনকিলার খাইয়ে দিলে ব্যথা কমে যাবে। কিন্তু আর যে সব ওষুধ দেওয়া দরকার তা কি স্টকে আছে? নমিতাকে ওখানে দাঁড়াতে বলে দিশা স্টোররুমে গেল। তিনটে আলমারিতে ওষুধ রাখা আছে। ডেলিভারির পর বেশি রক্তপাত হলে যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় সেটা ছেলেটিকে দিলে কেমন হয়? ওর নিশ্চয়ই খুব জ্বর আসবে। অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দেবে?

হঠাৎ পাশের আলমারিতে নজর গেল। একটা তাক ভরতি সেইসব বস্তু পড়ে আছে যার একটির জন্যে সূর্য তাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ওই বস্তুটির প্রয়োজন আদৌ বোধ করল না দিশা।

ছেলেটিকে ওষুধপত্র দিয়ে কিছুটা হালকা হল দিশা। এখন রাত এগারোটা। ইতিমধ্যে সংক্রমণ শুরু না হয়ে গেলে ছেলেটি বিপদমুক্ত। এখন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে খবরটা দেওয়া দরকার। কিন্তু কীভাবে? এই রাত্রে কাদা ভেঙে অতটা দূর যাওয়ার লোক পাওয়া যাবে না। সেই সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

ছেলেটি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। নমিতা ওর গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে জ্বর আছে গায়ে।'

'কিছু করার নেই এখন। ঘুমোক। তুমি সকালে অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে দিয়ো। আমিও একবার ঘুরে যাব। কিন্তু কাল সকালে কীভাবে থানায় খবর পাঠানো যায়?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।

'থানায় খবর পাঠাবেন?'

'বাঃ, পায়ে গুলি নিয়ে এখানে এসেছে, খবর পাঠানো আমাদের কর্তব্য।'

'দিদি, আপনি তো বললেন কোত্থেকে এসেছে জানেন না। অবস্থা খারাপ দেখে আপনি গুলিটা বের করে দিয়েছেন। ওর কথা তো এখানকার কেউ এখনও জানে না। ও যদি ভোরবেলায় চলে যেতে পারে যেতে দিন না।' নমিতা বলল।

'তুমি কী বলছ? কোথায় কী করেছে, খুনের আসামি হতে পারে ও। পরে পুলিশ যদি জানতে পারে তা হলে আমার কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছ?' দিশা মাথা নাড়ল।

নমিতা মাথা নিচু করল। বেরিয়ে আসার আগে কিছু নির্দেশ দিয়ে বারান্দায় পা রাখতেই সেই ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়াল, 'গুলি বেরিয়েছে?'

'হ্যাঁ। কী করে গুলি লাগল?'

'লেগে গেল। এখন কেমন আছে?'

'ঘুমোচ্ছে। যদি জ্বর তেমন না বাড়ে তা হলে ভয়ের কিছু নেই।'

'জ্বর এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'একটু দেখতে যেতে পারি?'

'ওকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। এখন বিরক্ত করবেন না।'

'ঘুমের ওষুধ? কেন?'

'আশ্চর্য! আমি আপনাকে কৈফিয়ত দিতে পারব না।' দিশা রেগে গেল, 'আর শুনুন, এটা পুলিশের কেস, কাল সকালে থানায় খবর দিতে হবে। আপনার নাম কী?'

'এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করছেন?' হাসল ছেলেটি, 'কোনও পেশেন্টকে ভরতি করার সময় আপনাদের খাতায় তার নাম-ধাম লেখা উচিত। গুলি বের করার সময় ও যদি মারা যেত তা হলে কী জবাব দিতেন? তা যখন করেননি তখন ভেবে নিন কোনও পেশেন্ট আজ এখানে আসেনি তাই পুলিশকে জানানোর দরকার নেই।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল দিশা। আহত ছেলেটিকে দেখে সে এমন উত্তেজিত হয়েছিল যে নমিতাকে প্রাথমিক কাজগুলো করার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। সে যে এখনও পেশাদার ডাক্তার হয়নি এটা তার প্রমাণ। দিশা সামলাবার চেষ্টা করল, 'ওটা তো এখনও আমরা করতে পারি। বেশ, ওর নাম-ঠিকানা বলুন, আমরা এন্ট্রি করে নিচ্ছি।'

'করবেন? ওর নাম স্বাধীনতা সৈনিক, ঠিকানা ভারতবর্ষ।'

অবাক হয়ে তাকাল দিশা। কী বলছে ছেলেটা? বইতে পড়েছে ব্রিটিশ আমলে অথবা নকশাল আন্দোলনের সময়ে ছেলেরা এই ভাষায় কথা বলত! ছেলেটি ওর মুখের অবস্থা দেখে হেসে ফেলল, 'এর কোনওটাই আপনি লিখতে পারবেন না। তা ছাড়া আমি ওকে নিয়ে এলাম, ব্যাপারটা দেখে আমাকে আটক না করে ওর পা থেকে গুলি বের করলেন এই অপরাধে আপনাকেই পুলিশ ধরতে পারে। আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন, ওর জীবন বাঁচিয়েছেন, এ জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু দিদি, প্লিজ, এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। আর হ্যাঁ, আপনার আপত্তি আছে যখন তখন আমি ভেতরে যাচ্ছি না। ভোর হলেই চলে যাব।'

নীচে নেমে আকাশের দিকে তাকাতেই অবাক হল দিশা। এত বৃষ্টি আর মেঘের হাঁকাহাকি চলল সারাদিন এবং সন্ধে জুড়ে, এখন কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছে আকাশে। যেন মেঘ সরিয়ে দিয়েছে কেউ ঝেঁটিয়ে একটা অংশ থেকে আর তারারা সুযোগ পেয়েছে নিজেদের দেখাবার।

বারান্দায় উঠে এল সে। দরজা ভেজানো। ঘরের আলো নেভানো। ভেতরে ঢুকে মশারির কাছে চলে এসে বুঝতে পারল সূর্য ঘুমিয়ে পড়েছে। গত রাত বাসে জেগেছিল, আজ সারাদিন ঘুমোয়নি, আর জেগে থাকা সম্ভব হয়নি। নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছিল। এই শব্দ দিশাকে স্বস্তি দিল। সে ঘুমাবার পোশাক পরে নিঃশব্দে বিছানায় উঠে এল। সূর্যর শরীর বিছানার অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। ঘুমের মধ্যে ওর শোওয়া কখনও ভাল নয়। কোনওরকমে এক কোণে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল দিশা। চোখ বন্ধ করতেই ছেলেটির মুখ। নাম, স্বাধীনতা সৈনিক, ঠিকানা ভারতবর্ষ। এরা কারা? সঙ্গে সঙ্গে সুকান্তর লাইন

মাথায় এল, ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু, ঠিকানার সন্ধান! ঘুম এল না। ওরা যাই বলুক, সে নিজে ভেবে পাচ্ছিল না কাজটা ঠিক করেছে না বেঠিক!

তখনও ভোর হয়নি। ঘুম ভেঙে গেল দিশার। ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে সূর্যর পায়ে হাত লেগে গেল। ঘুমের ঘোরে বিরক্ত হয়ে সূর্য কিছু বলল কি বলল না, আবার ঘুমিয়ে পড়ল। জানলার বাইরে তখন অন্ধকারে আলোর আভা মিশছে। নীচে নেমে বাথরুমে চলে গেল সে। তারপর রাত-পোশাকের ওপর চাদর জড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে এল। সারা রাত বৃষ্টি হয়নি। আকাশটাকেও বেশ পরিষ্কার লাগল। গাছের মাথায় এখন অন্ধকার এঁটোর মতো লেগে রয়েছে। হেলথ সেন্টারে এখনও আলো জ্বলছে।

সোজা বারান্দায় উঠে এল। তাকিয়ে দেখল সাইকেলটা নেই। দরজা ভেজানো। খুলে দেখল খাটটা শূন্য, নমিতাও এই ঘরে নেই। কোথায় গেল ছেলেটা। ওর যা অবস্থা ছিল তাতে আজ কোথাও যাওয়ার মতো শারীরিক ক্ষমতা থাকার কথা নয়। এই অবস্থায় হাঁটলেই আবার রক্তপাত হবে। তা ছাড়া ওইরকম চড়া ঘুমের ওষুধ ওকে হাঁটবার শক্তি দেবে না।

বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই সে নমিতাকে দেখতে পেল। তাকে দেখে নমিতা বলল, 'আপনি এসে গিয়েছেন? আমি ডাকতে যাচ্ছিলাম। ওর খুব পেইন হচ্ছে, মনে হয় ডেলিভারি হয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেল দিশা। এখানে মাত্র দুটো বিছানা আছে। এক রাতের জন্যে খুব বিপদে পড়া পেশেন্টদের রাখা হয়। সাধারণত নর্মাল ডেলিভারির কেসগুলো যদি পেইন ওঠে তা হলে অ্যাডমিট করা হয়ে থাকে।

এই মহিলা খুবই রুগ্‌ণা। মুখ চোখ বলে দিচ্ছে অ্যানিমিক, ঠিকমতো খাবার জোটে না। এখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। নিম্নাঙ্গ প্রায় উলঙ্গ করে রেখেছে এরা। বাচ্চাটি যে কোনও মুহূর্তে মায়ের শরীর থেকে বেরিয়ে আসবে। দিশা নমিতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'নাম কী?'

'সীতা।'

বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হল। বেশ স্বাস্থ্যবান শিশু। ও রকম শরীরে থেকে কী করে এত স্বাস্থ্য ও পেল তা ঈশ্বর জানেন। মা নেতিয়ে পড়ে আছে। দিশা মায়ের কাছে গেল। নমিতা তার কর্ম করছে। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে?'

মহিলা চোখ খুলল, 'কী হয়েছে?'

'আপনি কী চান?'

'ছেলে, ছেলে। ছেলে না হলে আমাকে আবার মরতে বসতে হবে।'

'আপনার আগে ক'টি সন্তান হয়েছে?'

'পাঁচটা। পাঁচটাই মেয়ে। যতদিন ছেলে না হবে ও ছাড়বে না। কী হয়েছে?' মহিলার কোটরে বসা চোখ বেরিয়ে আসছিল যেন।

'আপনার ছেলে হয়েছে। খুব সুন্দর ছেলে।' দিশা জানাল।

'আ—!' বিরাট স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল খাঁচা হয়ে যাওয়া বুক থেকে। তারপরই কেঁদে উঠল মহিলা। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল? কাঁদছেন কেন?'

'সত্যি তো ছেলে হয়েছে?'

'নমিতা, ওঁকে দেখাও।'

তোয়ালেতে জড়িয়ে শিশুটিকে নিয়ে এল নমিতা, 'দেখুন।'

প্রাণভরে পুত্রের মুখ দেখল মহিলা। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তুই না এলে আমি এবার ঠিক আত্মহত্যা করতাম। তুই আমার ভগবান।'

'আপনি ওর নাম রাখুন ঈশ্বর।'

'ঠিক বলেছেন।' মহিলার মুখে হাসি ফুটল।

বাচ্চাটাকে কাঁদাল নমিতা। এইসময় বাইরে মানুষের কথাবার্তা শোনা গেল। দিশা বেরিয়ে এসে দেখল দু'জন লোক নীচে দাঁড়িয়ে আছে। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি বাচ্চা বেরিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছে? মেয়ে?'

'না। ছেলে।'

'ছেলে?' বলেই প্রচণ্ড চিৎকার করে প্রায় ডিগবাজি খেয়ে পাশের লোকটিকে জড়িয়ে ধরল লোকটা, 'বহ্নিম, হয়েছে, শেষ পর্যন্ত ছেলে হয়েছে।'

হাঁ হয়ে গিয়েছিল দিশা। পাঁচটি কন্যা এখনও এদের কাছে আবর্জনা। পুত্র চাই। সেটা হয়েছে শুনে মনে হল ও লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। খুব রাগ হচ্ছিল তার। কিন্তু কিছু না বলে সে পাশের ঘরে চলে এল যেখানে ছেলেটির পা থেকে গুলি বের করেছিল। এখন সে কী করবে? ছেলেটি গেল কোথায়? ও ঘরের ব্যস্ততায় নমিতাকে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয়নি। নমিতা নিশ্চয়ই বলবে সে কিছুই জানে না। কিন্তু কাল রাত্রে মনে হয়েছিল ওদের ওপর নমিতার বেশ সহানুভূতি আছে। কেন?

নমিতা ঘরে এল, 'দিদি!'

দিশা তাকাল, 'বলো।'

'আমার কিছু করার ছিল না। তখন রাত তিনটে। বাইরে যে ছিল সে ঘরে ঢুকে বলল আর দেরি করতে পারবে না, ওকে নিয়ে যাবে। আমি আপত্তি করলাম। এভাবে পেশেন্ট নিয়ে যাওয়া যায় না। তখনও ও বেঘোরে ঘুমাচ্ছিল। এই ছেলেটা আমাকে ধমকাল। বলল পুলিশের হাতে ধরা পড়ার জন্যে তারা জন্মায়নি। আমি বললাম, এখনই নিয়ে গেলে পেশেন্ট মারা যেতে পারে। ও তখন রিভলভার বের করল।'

'রিভলভার?'

'হ্যাঁ দিদি। আমি আর কোনও বাধা দিতে পারলাম না। চেঁচাতেও পারলাম না। কী কী ওষুধ খাওয়াতে হবে তা জেনে নিয়ে, ওষুধ নিয়ে পেশেন্টকে কোলে করে বাইরে গেল ও। তারপর সাইকেলের রডে বসিয়ে অন্ধকারেই বেরিয়ে গেল এখান থেকে।'

'কোনদিকে গেল?'

'ওপাশে, জঙ্গলের দিকে।'

'এই পুরো ব্যাপারটাই আমাদের উচিত পুলিশকে জানানো।' দিশা বলল।

'দিদি, কেউ যখন দ্যাখেনি, জানে না, তখন পুলিশকে বলার কী প্রয়োজন? আপনি ভেবে দেখুন, আমি আর কী বলব!' নমিতা বেরিয়ে যাচ্ছিল।

দিশার চোখে পড়তেই সে ডাকল, 'নমিতা, ওখানে প্যান্টের কাটা পা পড়ে আছে এখনও। ওটাকে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে দাও।'

যশোমতী এসে গিয়েছিল। তাকে দেখে ভোরের রোদ মেখে একগাল হাসল, 'সবাই চেটেপুটে খেয়েছে। এর আগে কখনও খায়নি তো!'

'কী?' অন্যমনস্ক ছিল দিশা।

'ইলিশ মাছ। কালকে যে দিলে তুমি, মনে নেই?'

'ও।' দিশা হাসল, 'চায়ের জল গরম কর।'

'হয়ে গিয়েছে। দাদাকেও চা দিয়েছি। তুমি বসো, তোমার জন্যে নিয়ে আসছি।'

ঘরে ঢুকে দিশা দেখল খাটের ওপর আরাম করে বসে সূর্য চা খাচ্ছে। বলল, 'গুড মর্নিং। সেই গেলে আর এই এলে?'

'প্রায় সে রকমই।' চেয়ারে বসল দিশা।

চায়ে চুমুক দিয়ে সূর্য বলল, 'একটা সময় ঘুম ভাঙতে দেখি তুমি বাচ্চা

মেয়ের মতো শুয়ে আছ। আবার ভোরে দেখলাম, তুমি নেই। কী ব্যাপার?'

দিশার হাতে চায়ের কাপ দিয়ে গেল যশোমতী। দিশা তাকে বলল, 'এখন কী খাবি? বিস্কুট না মুড়ি?'

'বিস্কুট খাই?'

'ঠিক আছে।' মাথা নাড়ল দিশা। মেয়েটা চলে যেতে সে নিচু গলায় বলল, 'সত্যি, এরা কত অল্পে খুশি হয়।'

'আমি ভাবছিলাম ওকে কলকাতায় নিয়ে গেলে কেমন হয়!'

'ওর সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চলো।'

'তুমি তো স্বেচ্ছানির্বাসনে রয়েছ। যাক গে, রাত্রে কোন মায়ের বাচ্চা হল?'

'রাত্রে না, ভোরে।' দিশা গতরাতের ঘটনাগুলো ধীরে ধীরে বলে গেল। শোনার পর চোখ ছোট হয়ে গেল সূর্যর। চায়ের কাপ-ডিস নামিয়ে বলল, 'এখন কী করা উচিত!'

'তুমি বলো না।'

'শাঁখের করাত। এরা যদি উগ্রপন্থী হয় তা হলে পুলিশকে খবর দিলে তোমার ক্ষতি হবেই। আর পুলিশ যদি জানতে পারে তা হলে তোমাকে অ্যারেস্ট করবে।' সূর্য বলল।

'তা হলে?'

'আমি এখানে আছি, গুলি বের করে দেওয়ার আগে আমার সঙ্গে একবার আলোচনা করলে না?' সূর্য অনুযোগ করল।

'পরিস্থিতি সে রকম ছিল না।' দিশা বলল।

'যা হওয়ার তা হয়েছে। শোনো, আমি এখনই কলকাতায় রওনা হচ্ছি। এখান থেকে বাসে গিয়ে ট্রেন ধরব। রাত্রে পৌঁছেই তোমাকে টেলিগ্রাম করব; মা বা বাবা যে কেউ খুব অসুস্থ বলে। তুমি সেটা দেখিয়ে ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে যাবে।' সূর্য বলল।

'বাঃ। পরে পুলিশ যদি জানতে পারে তা হলে কি আমাকে ছাড়বে?'

'তা অবশ্য। পুলিশের জানার সম্ভাবনা কী রকম?'

'কেউ দ্যাখেনি। সবাই বৃষ্টির রাত বলে ঘুমোচ্ছিল। একমাত্র নমিতা জানে। কিন্তু ওর কথায় মনে হয়েছে ওদের সম্পর্কে দুর্বলতা আছে।'

'তা হলে চান্স নিতে পারো।'

'না। যাওয়ার আগে পুলিশকে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে যাওয়াই তো ভাল। এতে আমি পরিষ্কার থাকব। আর পুলিশকে জানালাম বলে ওরা নিশ্চয়ই

কলকাতায় আমার পেছনে ধাওয়া করবে না।' দিশা বলল।

'করবে না। কিন্তু তুমিও আর এখানে ফিরে আসতে পারবে না।' সূর্য হাসল, 'এটা একদিক থেকে ভালই হল। আমরা যে সমস্যার কোনও সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এই ঘটনায় সেটা হয়ে গেল। একেই বোধহয় বলে শাপে বর।'

সূর্যর মুখে খুশির ছাপ স্পষ্ট। খুব খারাপ লাগল দিশার। সে বলল, 'আমি ভয় পেয়ে চাকরি ছেড়ে দিলে সারাজীবন নিজেকে কী জবাব দেব?'

'আগুনে হাত রাখলে পুড়বে বলে লোকে হাত সরিয়ে নেয়। তাকে ভয় পাওয়া বলে না।'

'আমি তো জানি না এরা সেই আগুন কি না। সবটাই তো আমাদের অনুমান। আমি ছেলেটাকে বলেছি পুলিশকে খবর দেওয়া আমাদের কর্তব্য। সেটা না করলে যে বিপদে পড়ব তাও তার অজানা নয়। সেই কারণে ও রকম অসুস্থ পেশেন্টকে তুলে সে ভোর রাতে সাইকেলে বসিয়ে জঙ্গলে চলে গেছে। নাঃ। যা হওয়ার হবে, আমি পুলিশকে জানাব।' দিশা জোর দিয়ে বলল।

'ওরা যদি বদলা নেয়?'

'তার আগে ওদের ঋণ শোধ করতে হবে।'

'ঋণ?'

'ছেলেটির পা থেকে গুলি বের না করলে পা কেটে বাদ দিতে হত। এমনকী মারা যাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল।'

'ধুস! এ সব কৃতজ্ঞতাবোধ ওদের থাকে নাকি!'

সূর্য আছে তবু দিনটা বিশ্রীভাবে কাটল। অথচ কত সুন্দর ভাবনা ভেবে রেখেছিল দিশা এই দুটো দিনের জন্যে। সূর্যও কম কথা বলছে। তারও নিশ্চয়ই এতদূর জার্নি করে এসে এ রকম গুমোট আবহাওয়া ভাল লাগছে না।

সূর্যর বাস বিকেল ছ'টায়। বাড়ি থেকে পাঁচটায় বের হলে যথেষ্ট। কিন্তু সূর্য বলল, 'ওকে দুপুরে আসতে বলো। একটা নাগাদ।'

'কেন?'

'তোমার উচিত ডক্টর চৌধুরীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলা। ভদ্রলোককে কাল যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে ওঁর সাজেশন তোমার কাজে লাগবে।' সূর্য বলল।

'কিন্তু উনি তো আমার ইমিডিয়েট বস নন। ব্লক হেলথ সেন্টার—।'

হাত তুলে থামিয়ে দিল দিশাকে। 'জানি। কিন্তু উনি যদি তোমার বদলির চিঠি নিজের হাতে এখানে পৌঁছে দিতে পারেন তা হলে তুমিও আনঅফিশিয়ালি ওঁর অ্যাডভাইস চাইতে যেতে পারো।'

কথাটা ভাল লাগল দিশার।

বেলা একটা নাগাদ ওরা রওনা হল। সারা সকাল রোদ হওয়াতে রাস্তা একটু শক্ত হয়েছে কিন্তু ভূতপুলের দু'পাশে এখনও ভয়ংকর কাদা। গাড়ি টলতে টলতে এগোচ্ছিল।

চুপচাপ বসে ছিল সূর্য। দিশা আলতো করে ওর হাত স্পর্শ করল, 'এই, রাগ করেছ?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল সূর্য, 'না।'

'তা হলে যাওয়ার সময় এ রকম মুখ করে আছ কেন?'

'তুমি কবে আসছ?'

'সামনের শনিবারের পরের শনিবার।'

'আমার ভাল লাগছে না দিশা।'

'আমারও। কিন্তু আমি এত সহজে হেরে যেতে চাই না। তুমি আমাকে সাহায্য করবে না?'

সূর্য হাসল, কিছু বলল না। তারপর দিশার হাত আঁকড়ে ধরল। দিশার মনে হল সে অনেকটা আশ্বাস, অনেকটা সহানুভূতি পেয়ে গেল ওই মুহূর্তে।

সূর্য ঘড়ি দেখল, 'আজ খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাচ্ছি।'

'তুমি এখানে নেমে যাবে নাকি?' দিশা অবাক হল।

'এখান থেকেই তো বাসে উঠতে হবে।'

'তার তো অনেক দেরি। তুমি আমার সঙ্গে চলো!'

'ফিরে আসতে পারব?' সূর্য জিজ্ঞাসা করল।'

দিশা ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে জানল সাবডিভিশন্যাল হসপিটালে যেতে এখান থেকে মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগবে। সুন্দর পিচের রাস্তা, কোনও সমস্যা নেই।

দিশা খুশি হল, 'দুশ্চিন্তা দূর হল তো? আর হাঁড়িমুখো হয়ে থেকো না।'

ডক্টর চৌধুরী হাসপাতালে ছিলেন না। তাঁর বাংলো মিনিট পাঁচেক দূরে। ব্রিটিশ আমলের তৈরি বাগানওয়ালা দোতলা বাড়ি। গেটের কাছে পৌঁছে দিশা বলল, 'এঃ, একদম ভরদুপুরে এলাম। উনি হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছেন!'

'দেখে তো মনে হয়েছে দুপুরে ঘুমাবার পার্টি নয়।'

'পার্টি? বয়স্ক মানুষ সম্পর্কে কী কথা!'

গাড়ি থেকে নামতেই দিশা দেখতে পেল ডক্টর চৌধুরী দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন তাঁর পরনে পাঞ্জাবি পাজামা। সে চাপা গলায় বলল, 'জেগেই আছেন।'

সূর্য বলল, 'বললাম তো!'

ততক্ষণে নেমে এসেছেন ডক্টর চৌধুরী, 'ওয়েলকাম ডক্টরস। এই ঘরে বসা যাক।'

সুন্দর সাজানো বসার ঘরে ওরা ঢুকল। মুখোমুখি বসার পর ডক্টর চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাঞ্চ কি করা হয়েছে?'

সূর্য বলল, 'হ্যাঁ। করেই বেরিয়েছি।'

'তা হলে কী বলব? চা না কফি?'

দিশা বলল, 'কিছু না।'

'বেশ। কোনও সমস্যা?'

দিশা বলল, 'হ্যাঁ। ও আজ বিকেলের বাস ধরে কলকাতায় যাবে। ওকে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছোনোর জন্যে আসতেই হত। একটু আগে বেরিয়ে আপনার কাছে এলাম। যদিও আমার উচিত ছিল ব্লকের ডক্টরকে রিপোর্ট করা কিন্তু ও বলল আপনার কাছে আসতে।'

ডক্টর চৌধুরী চেয়ারে হেলান দিলেন, 'শোনা যাক।'

যেভাবে সূর্যকে সমস্ত ঘটনা জানিয়েছিল সেইভাবেই ডক্টর চৌধুরীকে বলল দিশা।

শেষ হওয়ার পর ডক্টর চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন সমস্যা কী?'

'আমার উচিত পুলিশকে জানানো!' দিশা বলল।

'অবশ্যই। এটা যদি ফোড়া কাটার মতো ব্যাপার হত তা হলে জানানোর দরকার ছিল না। কারও শরীরে বুলেট পাওয়া যাওয়া মানে যে কোনও ধরনের সংঘর্ষ হয়েছে। ওরা লুকিয়ে এসেছিল বলে বোঝাই যাচ্ছে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশের ওপর আইন রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই ওরা ছেলেটিকে খুঁজছে। আপনার উচিত ছিল আজ সকালেই থানায় রিপোর্ট করা।' ডক্টর চৌধুরী বললেন।

'থানা আমাদের ওখান থেকে অনেক দূরে। রাস্তাও খারাপ। তাই ভাবলাম দুপুরে যখন বের হব তখন আপনাকে জানিয়ে থানায় যাব।'

আমারবই.কম

'ওকে। কিন্তু প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে কোনও রকম অপারেশন করা যাবে না, অলিখিত আইনে নিষিদ্ধ বলা যেতে পারে। তার ওপর বুলেটে আহত কেস দেখে আপনি অপারেশন করলেন কী করে? পুলিশ প্রশ্নটা করবে এবং ডিপার্টমেন্ট কারণ দেখাতে বলবে। কী জবাব দেবেন আপনি?'

'ছেলেটির যে রকম অবস্থা ছিল, যেভাবে রক্ত বের হচ্ছিল তাতে ওকে কোথাও নিয়ে যেতে বলাটা অমানবিক হত।'

'বেশ। আপনি একজন মহিলার পেইন ওঠার পর সিজার করতে হবে বলে ওকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে পড়েছিল বলে দু'জনেই বেঁচে গেছে। ওকে ফেরত পাঠানোটা অমানবিক হয়নি?' ডক্টর চৌধুরী চোখ ছোট করলেন।

'হ্যাঁ। কিন্তু উপায় ছিল না। সিজার করার কোনও সুযোগই আমার ওখানে ছিল না, তাই ওকে বাঁচাতেই আমি নিয়ে যেতে বলেছিলাম।'

'গুলি কোথায় লেগেছিল?'

'থাই-তে।'

'জায়গাটাকে অসাড় করলেন কীভাবে?'

'করিনি। করার কোনও উপায় ছিল না।'

'মাই গড। তা হলে তো প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক কী কী করেছেন বলুন তো?'

দিশা বলল। সবটা শোনার পর ডক্টর চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই পেশেন্টকে নিয়ে সাইকেলে বসিয়ে চলে গেল। ওর তো আবার ব্লিডিং হবে।'

'আমি জানি না, আমি তখন বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম।'

'নার্স ছিল না?'

'তাকে রিভলভার দেখিয়েছিল।'

'বেশ। আপনি স্টেটমেন্ট দেবেন ওরা ভয় দেখিয়ে আপনাকে গুলি বের করতে বাধ্য করেছে। তারপর পেশেন্টকে তুলে নিয়ে চলে গেছে। রিভলভারের সামনে আপনি কোনও বীরত্ব দেখাতে পারেননি। বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নার্সকে বুঝিয়ে দেবেন। আপনাকে সাহায্য করার জন্যে সে-ও দায়ী হবে।'

'আমার মনে হচ্ছিল ওর ওদের ওপর সমর্থন আছে।'

'মাই গড। আপনি কি বুঝতে পারছেন এটা একটা ভয়ংকর অভিযোগ?'

'না, মানে, আমি অভিযোগ করছি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল ও চাইছিল আমি বুলেটটা বের করে দিই, পুলিশকে না জানাই।' দিশা বলল।

সূর্য কথা বলল, 'হয়তো ঝামেলা যাতে না বাড়ে সেকারণেই বলেছিল।'

ডক্টর চৌধুরী বললেন, 'হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার অভিমত না দেওয়াই ভাল। কী নাম নার্সটির?'

'আপনি ওর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবেন না তো!'

'আপনার রিপোর্ট না পেলে আমি কীভাবে ব্যবস্থা নেব। সে যে আদৌ ওদের সঙ্গে জড়িত এমন কোনও প্রমাণ আমার হাতে নেই।' ডক্টর চৌধুরী বললেন, 'উগ্রপন্থী সমস্যা এতদিন আমাদের জেলায় ছিল না। যেহেতু ওরা সংখ্যায় বাড়ছে তাই ইদানীং মাঝে মাঝেই পুলিশের সঙ্গে ওদের সংঘর্ষ হচ্ছে। সংঘর্ষে একটি মাত্র উগ্রপন্থীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। গতকাল বিকেল থেকে জেলা সীমান্তে ওদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। কাল রাত্রে ওই সংঘর্ষে আহত একজনকে নিয়ে কেউ আপনাদের হেলথ সেন্টারে গিয়েছিল। অ্যাডমিশনের সময় কী নাম বলেছিল?'

'আমি গিয়ে দেখেছিলাম আউটডোরের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। আর তখনই বুলেট বের করা নিয়ে এমন মানসিক চাপ অনুভব করেছিলাম যে অ্যাডমিশন হয়েছে কিনা খোঁজ করার কথা খেয়াল হয়নি। পরে সেটা করার জন্যে ওর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করতে যে জবাব দিল তা খাতায় লেখা সম্ভব নয়', দিশা বলল।

'কী বলল সে?'

দিশা সূর্যর দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'ওর সঙ্গী ছেলেটিকে নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, নাম স্বাধীনতা সৈনিক, ঠিকানা, ভারতবর্ষ।'

'হুম।' মিস্টার চৌধুরী গম্ভীর হলেন।

সূর্য ঘড়ি দেখছিল। এখনও হাতে সময় আছে। সেটা লক্ষ করে মিস্টার চৌধুরী বললেন, 'আপনি একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করুন। তার একটা কপি ব্লক মেডিক্যাল অফিসারকে দেবেন আমাকে ফরোয়ার্ড করার জন্যে। স্টেটমেন্টটা থানায় জমা দেবেন।'

ডক্টর চৌধুরী ডিকটেশন দিলেন, দিশা লিখে নিল।

সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিশকে জানানোর জন্যে ওর ওপর প্রতিহিংসা নেবে না তো ওরা?'

আমারবই ডট কম

'ওর বক্তব্যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকছে না। মনে হয় কোনও গোলমাল হবে না। বাই দ্য বাই, আপনি অফিশিয়াল ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে গেছেন?'

'না।'

'আজ সকালেই আপনার ব্লকের অফিসে পৌঁছে গিয়েছে। গেলে জানতে পারবেন। তা হলে আগামী কাল নতুন কাজে যোগ দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওয়েল, ডক্টর, কলকাতায় পৌঁছোতে আপনার সকাল হয়ে যাবে, না?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় বাড়ি যেন?'

সূর্য ঠিকানা বলল। ডক্টর চৌধুরী মাথা নাড়লেন, 'আপনার স্ত্রীর এই ব্যাপার নিয়ে মোটেই চিন্তা করবেন না। আচ্ছা—!'

ওরা উঠে দাঁড়াল। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি ফিরে যাওয়ার পথে থানায় এটা জমা দিয়ে যাব?'

'অবশ্যই।' ডক্টর চৌধুরী মাথা নাড়লেন।

ওরা গাড়িতে উঠল। যতক্ষণ না গাড়ি গেট পেরিয়ে বাইরে গেল ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। সূর্য বলল, 'উনি নতুন কিছু বললেন না। এটা আমিই তোমাকে বলেছিলাম।'

'তবু ওঁকে জানিয়ে আসা গেল।'

'দেখি স্টেটমেন্টটা।'

দিশা কাগজটা দিল। মন দিয়ে পড়ল সূর্য। তারপর মাথা নাড়ল, 'নাঃ। এই ভদ্রলোক বেশ বুদ্ধিমান। এমনভাবে লিখেছেন যাতে তোমাকে কেউ দোষী না করতে পারে।'

মাথা নাড়ল দিশা। বলতে ইচ্ছে করল ডক্টর চৌধুরী লেখেননি, বলেছেন। লিখেছে সে। কিন্তু কথা বাড়াল না।

শহর ছাড়বার আগে জেরক্স করে নিল লেখাটা। দুটো কপি। একটা কপি ব্লক মেডিক্যাল অফিসারকে যে চিঠি দেবে তার সঙ্গে জুড়ে দেবে।

সময় হয়ে আসছিল। এখনও অবশ্য একঘণ্টা বাকি। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছে পথেই থানা পড়বে। সূর্যের ইচ্ছে ছিল, তাকে বাসস্টপে নামিয়ে দিয়ে দিশা থানায় যাক। কিন্তু দিশা বলল, 'তুমি বাসে ওঠার সময় আমি থাকব না? থানায় কতক্ষণ লাগবে। দেব আর চলে আসব। এখনও অনেক দেরি

তোমার বাস আসার!'

অতএব থানায় যাওয়া হল।

সেপাইদের নিজের পরিচয় দিয়ে দিশা শেষ পর্যন্ত যখন দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারল তখন মিনিট পনেরো সময় নষ্ট হয়েছে। নিজেদের পরিচয় দিল ওরা।

দারোগা তাদের বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন, কী করতে পারি?'

'আমি একটা স্টেটমেন্ট দিতে চাই।' দিশা বলল।

'কী ব্যাপারে?'

'এটা পড়লেই বুঝতে পারবেন।' দিশা কাগজটা এগিয়ে দিল।

পড়ার আগ্রহ ভদ্রলোকের ছিল না। তবু নিলেন। চোখ বোলাতে গিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। পুরোটা পড়ার পর বললেন, 'সর্বনাশ। এ কী করেছেন আপনি?'

'মানে?' দিশা হকচকিয়ে গেল।

'একটা উন্ডেড ক্রিমিন্যালকে হাতের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিলেন।'

'ক্রিমিন্যাল?'

'অফকোর্স ক্রিমিন্যাল। পুলিশ মারছে, কিডন্যাপ করছে। ইস্। তারপর আপনি ওর পা থেকে বুলেট বের করে দিয়েছেন? আপনি ডাক্তার হয়েও জানেন না পুলিশকে না জানিয়ে এই কাজ করা আইনের চোখে অপরাধ করা?'

'জানি। কিন্তু আপনি আমার স্টেটমেন্ট ভাল করে পড়ুন।'

'কী পড়ব? আপনি প্রচণ্ড অন্যায় করেছেন।' চিৎকার করলেন দারোগা।

'আমাদের প্রাইমারি হেলথ সেন্টার থেকে অত রাত্রে ওই রাস্তায় কাউকে থানায় পাঠানো সম্ভব ছিল না। তা হলে খবর দেব কী করে?'

'লোকজন ডেকে ওকে আটকে রাখতেন।'

'তা হলে ও মারা যেতে পারত।'

'যেত। ও রকম ক্রিমিন্যাল মারা গেলে দেশের কোনও ক্ষতি হত না।'

'আমি জানতাম না ও ক্রিমিন্যাল। ও রকম মরণযন্ত্রণা পাচ্ছে বলে আমি মানবিকতার খাতিরে ওর পা থেকে গুলি বের করে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সকাল হলে আপনাদের খবর পাঠাব। কিন্তু শেষরাত্রে ওর দলের লোকজন রিভলভার দেখিয়ে আমার নার্সকে চুপ করিয়ে ওকে নিয়ে যাবে এটা ভাবতে পারিনি। অবশ্য ওর যা অবস্থা নিয়ে যাওয়ার পর ঠিকঠাক চিকিৎসা না চললে বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম।' দিশা বলল।

'ঠিক আছে। সকালে কাউকে পাঠিয়ে খবর দিলেন না কেন?'

'সকালেই একটা ক্রিটিক্যাল মেটারনিটি কেস নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ি। তখন দুটো প্রাণ বাঁচানোই আমার কাছে জরুরি ছিল। তারপর দুপুরে আমার স্বামীকে বাসস্টপে পৌঁছোতে হবে বলে ওর সঙ্গে বেরুচ্ছি তাই লোক পাঠাইনি, নিজেই এসেছি।'

'যাকে এত মানবিকতা দেখালেন, তার নাম কী?'

'নাম বলতে পারেনি।'

'দেখুন। তবু আপনার মনে হয়নি লোকটা ক্রিমিন্যাল। নিজের নাম কারা লুকায়?' দারোগাকে হাউন্ডের মতো দেখাচ্ছিল।

'না। ওর নাম বলার মতো অবস্থা ছিল না। অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল।'

'হুঁ! আপনার সঙ্গে যে নার্স ছিল তার নাম কী?'

'নমিতা মণ্ডল।'

'ঠিক আছে, আপনি হেলথ সেন্টারে থাকবেন আমি তদন্তে যাব।'

'গেলে কাল দুপুরের মধ্যে আসবেন।'

'কেন?'

'আমার ট্রান্সফার অর্ডার এসেছে। কাল চলে যেতে হবে।'

'নো। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি কোথাও যেতে পারবেন না। আমি আপনার বস্-এর সঙ্গে কথা বলছি।'

'বেশ। ডক্টর শান্ত চৌধুরী, সাবডিভিশন্যাল মেডিক্যাল অফিসার।'

'আমি ওঁকে চিনি।'

'এবার আমি উঠতে পারি?'

দিশা জিজ্ঞাসা করা মাত্র সূর্য মনে করিয়ে দিল, 'এটাকে ডায়েরি হিসেবে ট্রিট করে একটা নাম্বার দিলে ওর পক্ষে ভাল হয়।'

দারোগা বললেন, 'ডায়েরি? ডায়েরি করবেন?'

দিশা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। ডিপার্টমেন্ট তাই চাইবে।'

দারোগা বললেন, 'এটা আপনার কনফেশন। কোনও অভিযোগ নয়। আপনি যদি অভিযোগ করেন ওরা আপনাকে রিভলভার দেখিয়ে অত্যাচার করে আপনাকে দিয়ে জোরজবরদস্তি করে অপারেশন করিয়ে নিয়েছে তা হলে ডায়েরি করতে পারেন। তাই করবেন?'

দিশা তাকাল সূর্যর দিকে। সূর্য বলল, 'একটি অর্ধমৃত মানুষ জোরজবরদস্তি কী করে করবে? সেটা তো মিথ্যে কথা বলা হবে।'

'তা হলে আমার কিছু করার নেই।' মাথা দোলালেন দারোগা।

'বেশ। আপনি যে স্টেটমেন্টটা পেলেন তার একটা রশিদ করে দিন।'

'এর কোনও কপি আছে?' হাত বাড়ালেন দারোগা।

নিজের কপিটা দিল দিশা। কেরানিকে ডেকে নির্দেশ দিলেন দারোগা।

ওরা উঠে পড়ল। নমস্কার জানিয়ে কেরানির কাছ থেকে কপিটা নিয়ে বেরিয়ে এল। গাড়িতে উঠে সূর্য বলল, 'আর পনেরো মিনিটও নেই। কুইক।'

গাড়ি চলতে শুরু করলে সূর্য হাসল, 'ওঃ, মনে হচ্ছিল তোমাকে না গারদে পুরে দেয়।'

'ইস্। এত সস্তা।'

'হ্যাঁ পুলিশের কাছে সস্তা। যাকগে, তুমি ফিরে গিয়ে নার্সকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ো কী বলতে হবে।'

হঠাৎ সূর্যর হাত ধরল দিশা, 'এবার যে কী হল! তোমাকে সময় দিতে পারলাম না। খুব খারাপ কেটেছে তোমার।'

'খারাপ কেন! এটাও জীবনের একটা অংশ। তোমার ট্রান্সফার পুলিশ আটকে দিল কিনা জানিয়ো।'

'হুঁ।'

ওরা বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছোলে দেখল আজ বেশ ভিড় হয়েছে। সূর্য বলল, 'বসার জায়গা না পেলে মুশকিল হবে।'

বলতে না বলতেই দূরে বাস দেখা গেল। দিশা বলল, 'তোমাকে যা বলেছি তা মনে রেখো কিন্তু!'

'হ্যাঁ।'

'চিঠি দেবে।'

'ঠিক আছে।'

বাস এসে দাঁড়াতে দেখা গেল কিছু সিট খালি আছে। লোকজন দুদ্দাড় করে উঠে গেল। কন্ডাক্টার নেমে এসেছিল নীচে। লোকটাকে চিনতে পারল দিশা। সূর্য যেদিন এসেছিল এই লোকটিই ডিউটিতে ছিল। কন্ডাক্টার বলল, 'পৌঁছোতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

কন্ডাক্টার মুখ তুলে বাসের ভেতর দেখতে চেষ্টা করল। সূর্য দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ সে ওঠার আগেই অন্যান্যরা জায়গা দখল করে ফেলেছে।

কন্ডাক্টার ডাকল, 'ও দাদা, এই যে—।'

দিশা দেখল সূর্য শুনতে পাচ্ছে না, তখনও সিট খুঁজছে।

কন্ডাক্টার গলা চড়াল, 'এই যে ঘুমদাদা—।'

এবার তাকাল সূর্য। এগিয়ে এল দরজার কাছে। কন্ডাক্টার তাকে বলল, 'আপাতত আমার সিটে বসুন। পরে জায়গা পেয়ে যাবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' সূর্য বসে পড়ল।

কন্ডাক্টার দিশাকে বলল, 'অতদূর রাস্তা দাঁড়িয়ে গেলে উনি ঘুমাবেন কী করে! যান, আর চিন্তা করবেন না।' বাস ছাড়ল। হাত নাড়তে গিয়ে চোখে জল এসে গেল। কিন্তু তবু কী রকম মজা লাগল। আজ থেকে সূর্যকে সে ঘুমবাবু বলে ডাকবে।

প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে ফিরতেই সন্ধে পেরিয়ে গেল। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বিদায় করার আগে পরের দিন দুপুরে আসার জন্যে অনুরোধ করল সে।

লোকটা ইতস্তত করছিল, 'কিন্তু দিদি, আপনার যদি যাওয়া না হয়?'

'মানে?'

'তখন দাদার সঙ্গে কথা বলছিলেন। শুনলাম পুলিশ আপনার বদলি আটকে দেবে।'

'এখনও তো দেয়নি। দিলে দেখা যাবে। আর যদি দেয় তা হলেও আপনার ভাড়া পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে?' বিরক্ত হয়ে বলল দিশা।

'ভাড়ার জন্যে বলছি না দিদি।'

'তা হলে?'

'আপনি কীভাবে কথাটা নেবেন বুঝতে পারছি না।'

'আপনি বলতে পারেন।'

'না থাক।' আচমকাই গাড়িতে উঠে হেডলাইট জ্বেলে লোকটা চলে গেল। এ রকম ব্যবহার কেন করল বুঝতে পারল না দিশা। কী বলতে চেয়েছিল ও?

হেলথ সেন্টারে ঢুকতেই ধর্মদাসবাবু এগিয়ে এলেন, 'আপনার জন্যে বসে আছি।'

ধর্মদাসবাবু এই হেলথ সেন্টারের শুধু ক্লার্ক নয়, কথাবার্তা শুনলে মনে হবে উনিই সর্বেসর্বা। দিশা বলল, 'কী ব্যাপার?'

'আপনার একটা চিঠি এসেছে। নিন। সই করে নিন।'

চিঠিটা সই করে নিল। ধর্মদাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুললেন না?'

'এতে কী আছে তা আমার জানা। আমাকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। শুনুন, আমি কাল সকাল অবধি এখানে আছি। যদি কোনও অফিশিয়াল কাজ পেন্ডিং থাকে তা হলে তার মধ্যে শেষ করবেন।' দিশা বলল।

মাথা নেড়ে চলে গেলেন। কারও থাকা বা যাওয়া নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই মানুষটার। আজ সুজাতা নামের একটি মেয়ে ডিউটিতে। তাকে নমিতার কথা জিজ্ঞাসা করল দিশা। সুজাতা বলল, 'নমিতার আজ ছুটি দিদি।'

'সে কোথায়?'

'ঘরে।'

'একটু ডেকে নিয়ে এসো তো।' নিজের ঘরে ঢোকার আগে দিশা অন্য ঘরটাতে গেল। সেখানে একটি মহিলা শুয়ে আছে। তাকে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। সে কাছে গেল, 'কী হয়েছে আপনার?'

'জানি না।' নির্জীব গলায় বলল মহিলা।

'এখানে কেন নিয়ে এসেছে আপনাকে?'

'মেরে ফেলতে।' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল মহিলা।

এই হল এদের স্বভাব। কিছুতেই মুখ খুলবে না। নিজের ঘরে এসে চেয়ারে বসল সে। ড্রয়ারে কিছু ব্যক্তিগত কাগজ আছে। সেগুলো বের করে একটা খামে পুরল। এই সময় নমিতা এল। পরনে আটপৌরে শাড়ি, 'ডেকেছেন দিদি?'

'হ্যাঁ। নমিতা, আমাকে বদলি করা হয়েছে।'

'যাঁ? কী করে জানল?' আঁতকে উঠল মেয়েটা।

হেসে ফেলল দিশা, 'না না। এটা আগেই ঠিক হয়ে ছিল। শোনো। কাল পুলিশ আসতে পারে। আমি থানায় স্টেটমেন্ট দিয়েছি।'

'আপনি পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছেন?' প্রচণ্ড হতাশ দেখাল নমিতাকে।

'হ্যাঁ। পুলিশ জানতে পারলে খুব খারাপ হত। ঠিক জেনে যেত ওরা।'

'কী বলেছেন?'

'হ্যাঁ। সে কথা বলার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। তার আগে বলো, এখানকার ক'জনকে তুমি বলেছ?'

'কাউকে না। মাকালীর দিব্যি।'

'মা কালীর দিব্যি শুনতে চাই না, তুমি বললেই হবে।' হেসে ফেলল দিশা, 'শোনো, আহত ছেলেটিকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় হেলথ সেন্টারের বারান্দায় পাওয়া গিয়েছিল। বৃষ্টি এবং অন্ধকার থাকায় কে বা কারা ওকে এনেছিল তা জানা যায়নি। তুমি প্রথম দেখতে পাও। দেখে আমাকে খবর দাও নিজেই। আমি আসি। ছেলেটির অবস্থা খুব খারাপ হচ্ছিল কারণ রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওকে

বাঁচাবার জন্যে আমি আর তুমি ভেতরে নিয়ে যাই। আমি অপারেশন করে গুলি বের করি। তারপর ঘুমের ইঞ্জেকশন দিই। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওর নাম কী? ও শুধু বলতে পেরেছিল ওর নাম স্বাধীনতা সৈনিক, ঠিকানা ভারতবর্ষ। তারপর ও ঘুমিয়ে পড়ে। আমি তোমাকে বলি কাল সকালে থানায় এবং ব্লক অফিসে খবর দিতে হবে। তারপর আমি আমার বাসায় চলে যাই। ভোরের আগে কয়েকজন এসে ছেলেটিকে নিয়ে যেতে চায়। তুমি বাধা দিলে ওরা রিভলভার দেখায়। মেরে ফেলবে বলে শাসায়। তোমার কাছ থেকে সমস্ত ওষুধ নিয়ে ছেলেটিকে সাইকেলে বসিয়ে ওরা চলে যায়। তুমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু তখনই এখানে ভরতি হওয়া একজন মহিলার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় তুমি তাকে অ্যাটেন্ড করতে ছুটে যাও। ভোরবেলায় আমি এলে সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে জানাও।'

দিশা থামলে নমিতা বলল, 'ঠিক আছে।'

'না ঠিক নেই, আরও আছে। যে মহিলার বাচ্চা হবে তার পেছনে আমার আর তোমার অনেকটা সময় যায়। বাচ্চা হওয়ার পরেও মহিলার অবস্থা ভাল ছিল না। সব কিছু সামলে বাসায় যেতে যেতে আমার ন'টা বেজে যায়। তখন তোমার জায়গায় স্বপ্না ডিউটি করতে আসায় তুমিও বাসায় চলে যাও। ব্যাস, এইটুকু। মনে থাকবে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নমিতা।

'দেখো। কোনও গোলমাল যেন না হয়।'

'না হবে না।' নমিতা মাথা নাড়ল। 'কিন্তু দিদি, আপনি কালই যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর যদি পুলিশ আসে?'

'এইমাত্র যা শুনলে তা বলতে পারবে না?'

'কেন পারব না? কিন্তু সবাই বলে মুখ বন্ধ করে রাখতে।'

'ঠিকই বলে। তবে পুলিশ তো তোমার মুখ না খুলিয়ে ছাড়বে না।'

'ওই একটা জিনিস আমি কিছুতেই পারি না। কথা চেপে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।'

'তোমাকে সেটাই করতে হবে। নইলে তুমি ওদের শত্রু হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে দিদি।'

দিশা উঠল। নমিতা তাকে টর্চ জ্বেলে কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দিয়ে গেল। কোয়ার্টার্সের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। গলার স্বর পেয়ে দৌড়ে এসে যশোমতী

দরজা খুলল, 'দাদা চলে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ রে। ঠিক আছে নমিতা। কাল দেখা হবে।'

নমিতা চলে যাওয়ামাত্র যশোমতী বলল, 'এসো, হাত-মুখ ধোও। তোমার সঙ্গে কথা বলবে বলে সেই বিকেল থেকে মা বসে আছে।'

দিশার মনে পড়ে গেল। সে ভেতরে পা বাড়াল।

যশোমতীর মা গালে হাত দিয়ে বসে ছিল। এ রকম একটা গণ্ডগ্রামের প্রায় নিঃস্ব এক পরিবারের মেয়ের নাম কীভাবে যশোমতী রাখা হল সেটাও বিস্ময়ের। যশোমতীর মা এখানকার আর পাঁচটা মায়ের মতো রোগা, শরীরে অসুখ পোষা আছে কিন্তু বাধ্য না হলে হেলথ সেন্টারে আসবে না। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

'আপনি চলে যাচ্ছেন দিদি?'

'হ্যাঁ। বেশি দূরে নয়, এখান থেকে বড়জোর এক ঘন্টার রাস্তা।'

'মেয়ে আমার মাথা খারাপ করে দিল। সে আপনার সঙ্গে যাবেই।'

'ওর বাবা কী বলে?'

'সে তো বিদায় করতে পারলে বাঁচে। একজনের খাবার বাঁচবে।'

'ও। তোমার কি ইচ্ছে নেই?'

'মেয়ের মা হলে বুঝতে পারবেন। চোখের সামনে বড় হচ্ছে। মুখ দেখলেই মনের কথা টের পাই। চোখের আড়ালে গেলে তো কিছুই জানতে পারব না। যদি নষ্ট হয়ে যায়?'

'কী বলছ তুমি? কত বয়স ওর?'

'এতদিন আধা খেয়ে ছিল তাই বাড়েনি। এই একমাস পেটে ভালমন্দ খাবার পড়ছে, আর দেখতে হবে না।' শব্দ করে নিশ্বাস ফেলল যশোমতীর মা।

'তুমি কি চাও ওর চেহারা শুকনো ক্ষয়াটে হোক?'

'গরিব ঘরের মেয়ে হলে সেটাই তো বাঁচায়। আপনি এ সব বুঝবেন না দিদি। পুরুষ মানুষ শুধু স্বাস্থ্য চায়। ওই যে আপনার হাসপাতালে আজ যে ভরতি হয়েছে তার অবস্থা তো সবাই চোখের সামনে দেখছে, কেউ কিছু বলছে? এখানে সবাই মেনে নিয়েছে।'

অবস্থাটি কী জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে সামলে নিল দিশা। এদের মুখের কোনও রাখঢাক নেই, মেয়ের সামনেই হয়তো যে কথা বলার নয় তা বলে ফেলবে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার যদি আপত্তি থাকে তা হলে ও এখানেই থাক।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু করল যশোমতী। প্রতিবাদ শেষ হল নাকি কান্নায়।

আমারবই.কম

ওর মা বলল, 'অ্যাই চোপ্! মেয়েমানুষের অত গলা কীসের। দিদি, আপনি যদি ওর দায়িত্ব নেন তা হলে যাক!'

'ও যদি আমার কথা শোনে তা হলে—।'

'শুনব। সব কথা শুনব।' দিশাকে কথা শেষ করতে দিল না যশোমতী।

'বেশ। আমার কাল দুপুরে এখান থেকে যাওয়ার কথা। তার মধ্যে ওকে তৈরি করে দিয়ো। তোমরাও ওকে দেখতে যাবে, ও প্রত্যেক সপ্তাহে তোমাদের কাছে একবার আসতে পারে।'

মাথা নাড়ল যশোমতীর মা, 'খুব ভাল। আর একটা কথা—।'

'বলো।'

'ওকে দশ টাকা বেশি মাইনে দেবেন?'

'ঠিক আছে।'

'আর ওর বাবার হাতে টাকাটা দেবেন না। ও যখন এখানে আসবে তখন আমাকে দেওয়ার জন্যে ওর হাতে দেবেন।' যশোমতীর মা বলল।

'তাই হবে।'

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বিছানায় বসল দিশা। পৃথিবীর কত নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস নিয়েও একসঙ্গে থাকে! থাকতে বাধ্য হয়।

হঠাৎ বিছানা, চেয়ার, মশারির দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। এই ঘরে দু' দুটো রাত কাটিয়ে গিয়েছে সূর্য। অথচ এখন সে নেই। কলকাতাগামী বাসে যে লোকটা এই মুহূর্তে বসে আছে সে কখনওই আর এই ঘরে আসবে না। কালকের পরে আসবে না সে নিজেও। তবু এখন ঘরটাকে কী রকম নিজের নিজের বলে মনে হচ্ছিল। হঠাৎ খাটের ওপাশে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল দিশা। রুমাল। সূর্য খেয়াল করেনি। নাকের কাছে নিয়ে আসতেই সে সূর্যর ঘ্রাণ পেল।

ভোরবেলায় বারান্দায় এসে বসেছিল দিশা। জিনিসপত্র যা আছে তার কিছু গতরাত্রে প্যাক করে রেখেছিল, আজ রান্না-খাওয়ার পর বাকিটা হবে। এখনও সূর্য ওঠেনি। হিসেবমতো কলকাতার খুব বেশি দূরে বাসটা নেই। কন্ডাক্টার নিশ্চয়ই পরে সিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সূর্যকে।

এখনও রোদ ওঠেনি। তবে তার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। আকাশে মেঘ নেই। দিশা দেখতে পেল নমিতা দ্রুত তার বাসার দিকে এগিয়ে আসছে। সে উঠে দাঁড়াল।

সামনে এসে নমিতা বলল, 'দিদি, পুলিশ যদি জিজ্ঞাসা করে অপারেশন কীভাবে হল, প্যান্ট খুলে না কেটে, কী বলব?'

একদম মাথায় ছিল না। দিশা নমিতার বুদ্ধি দেখে খুশি হল, 'ওই অবস্থায় তো প্যান্ট খোলা সম্ভব নয়। সহজ যেটা সেটাই করা হয়েছে। প্যান্টের একটা পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে ক্ষতস্থানের একটু ওপর থেকে।'

'পুলিশ যদি সেই কাটা প্যান্টের টুকরো দেখতে চায়?'

'ওটা তো—, তুমি নষ্ট করে ফেলেছ?'

'আপনি তো তাই বললেন। রক্ত লেগেছিল। আমি সেটা জলে ধুয়ে মাটিতে পুঁতে দিয়েছি।'

'তুলে আনা যাবে না?'

'যাবে কিন্তু সেখানে তো রক্তের কোনও চিহ্ন নেই, উলটে ভেজা মাটি লেগে থাকবে।'

'তা হলে?' দিশা ফাঁপরে পড়ল।

'আমি একটা কথা বলব?' নমিতা চোখ বড় করল।

'বলো।'

'আপনি তো কোথাও বলেননি যে ছেলেটা ফুলপ্যান্ট পরে এসেছিল, বলেছেন?'

'না।'

'জিজ্ঞাসা করলে বলব ও হাফ প্যান্ট পরা ছিল।'

হেসে ফেলল দিশা, 'তোমার মাথায় এ সব বেশ খেলে তো!'

'আপনি জানেন না দিদি, পুলিশকে বিশ্বাস নেই।'

'আচ্ছা নমিতা, তুমি ওদের কি চেনো?'

'ওই দু'জনকে? নাঃ। কখনওই দেখিনি।'

'কিন্তু তুমি ওদের উপকার করতে চেয়েছিলে। কেন?'

মাথা নিচু করে রইল নমিতা। সেটা দেখে দিশা বলল, 'বলতে ভয় পাচ্ছ কেন?'

নমিতা বলল, 'ওরা তো ডাকাত নয়। তা হলে বাড়ি-ঘর ছেড়ে, আরাম ছেড়ে কেন জঙ্গলে পাহাড়ে লুকিয়ে বেড়ায়? কী জন্যে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে? পুলিশ মানেই তো গুণ্ডা। আপনি গ্রামের মানুষদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন কেউ পুলিশের প্রশংসা করবে না। সত্যিকারের গুণ্ডা ডাকাত বদমায়েশদের সঙ্গে ওদের তফাত হল তাদের ধরার জন্যে পুলিশ আছে কিন্তু এদের ধরার জন্যে

কোনও পুলিশ নেই, ঘুষ না দিলে কোনও কাজ হবে না। তবু সরকার মাইনে দিয়ে এদের পোষে। ওই ছেলেগুলো এই পুলিশদের শাস্তি দিতে চায়। ওদের নিজেদের তো কোনও স্বার্থ নেই।'

অবাক হয়ে শুনছিল দিশা। এই তিনমাস ধরে সে নমিতাকে দেখেছে কিন্তু ওর মনে যে এইসব কথা জমে আছে তা কখনও টের পায়নি। দিশা জিজ্ঞাসা করল 'তুমি যা বললে তা কার কাছ থেকে শুনেছ?'

'সবাই বলে।'

'ঠিক বলে না। পুলিশ মানেই ঘুষখোর, অসৎ নয়। অনেক সৎ মানুষ পুলিশের চাকরি নিয়েছেন দেশের মানুষের সেবা করবেন বলে। কয়েকজন খারাপ মানুষের কারণে একটা গোটা ডিপার্টমেন্টকে খারাপ বলা অত্যন্ত অন্যায়। তাদের কেউ কেউ যদি অন্যায় করে থাকে তা হলে আদালত আছে, ওপরওয়ালা আছে, মন্ত্রী আছেন। এঁদের কাছে অভিযোগ পৌঁছে দিলে নিশ্চয়ই সুবিচার পাওয়া যাবে। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কারও নেই।'

দিশা যখন কথা বলছিল তখন নমিতা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তা হলে আপনি কাল ওই ছেলেটাকে কেন বাঁচালেন?'

'সম্পূর্ণ মানবিক কারণে। ওর জায়গায় একজন দাগি ক্রিমিন্যাল হলেও একই কাজ করতাম।' দিশা গলা সহজ করার চেষ্টা করল, 'নমিতা তোমার মাথা থেকে ও সব ভাবনা সরাও। এখানে আসার পর যেটুকু আমি শুনেছি তাতে বুঝেছি ওই ছেলেগুলোর আক্রোশ পুলিশের ওপর নয়। আমাদের দেশের সরকারের ওপর। যেহেতু সরকার পুলিশকে ওদের মোকাবিলা করার দায়িত্ব দিয়েছে তাই ওরা চোরাগোপ্তা পুলিশের ওপর আন্দোলন করে। বুঝতে পেরেছ?'

নমিতা মাথা নাড়ল, কী বুঝল সেই জানে।

ব্লক হেলথ সেন্টারে ডাক্তারকে যে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার কথা সেটা লিখে ঠিক ন'টার সময় হেলথ সেন্টারে গেল দিশা। নিজের চেয়ারে বসতেই ধর্মদাসবাবু এলেন, 'দিদি, আপনি কখন যাবেন?'

'দুপুরে।'

'অ। তা হলে আমি এখন একটু ব্লক হেলথ সেন্টার থেকে ঘুরে আসি।'

'কেন?'

'আপনার জায়গায় কে আসছেন তা তো জানি না। কিছু রিক্যুইজিশনও দেওয়ার ছিল।'

'বেশ। ও হ্যাঁ, যাচ্ছেন যখন তখন এই খামটা বি ডি-কে দিয়ে দেবেন।'

'অফিশিয়াল?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে কি রশিদ করিয়ে নেব?'

এ সব কথা খেয়াল থাকে না দিশার। রশিদ তো রাখাই উচিত। সে বলল, 'হ্যাঁ। আমি রশিদটা বানিয়ে দিচ্ছি আপনি স্ট্যাম্প লাগিয়ে সই করিয়ে আনবেন। আপনি এলে আমি বের হব। বেশি বেলা করবেন না।'

'না না। আমি বাড়ি ফিরে নাওয়া-খাওয়া সারব।'

ধর্মদাসবাবু চলে যাওয়ার পর নার্সরা, সুইপাররা ইত্যাদি দরজায় এসে দাঁড়াল।

দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

সুজাতা বলল, 'আপনি আজ চলে যাচ্ছেন দিদি।'

'হ্যাঁ ভাই।'

'আমরা আপনাকে ফেয়ারওয়েল দেওয়ার সময়ও পেলাম না।' সুজাতা বলল।

'দূর। এই তো এখান থেকে ওখানে যাচ্ছি। তোমাদের সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা হবে, ও হ্যাঁ, কাল রাতে যে মহিলা ভরতি হয়েছিল তার অবস্থা কী রকম?'

'এখন ভাল।'

'কী হয়েছিল বলো তো? আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উত্তর দিতে চাইল না।'

'ওর ওপর খুব অত্যাচার হয়, খেতে দেয় না, মারধোর করে। না খেয়ে না খেয়ে ওই অবস্থা। বোধহয় পেটে আলসার হয়ে গেছে। চিকিৎসা করাবে না, যখন দেখবে মরোমরো তখন আমাদের কাছে নিয়ে আসবে। আবার মজা দেখুন, ঠিক বেঁচে ফিরে যায়।'

'কে অত্যাচার করে? স্বামী?'

সুজাতা অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'না, ছেলের বউ।'

'সেকী? এ তো উলটো শুনছি। স্বামী তো আছে।'

'হ্যাঁ। ছেলে বাইরে থাকে। মাঝে মাঝে আসে।'

'স্বামী ছেলের বউকে কিছু বলে না?'

'না। ওরা তো একসঙ্গে থাকে।'

'কী?' চিৎকার করে উঠল দিশা।

একজন আয়া বলল, 'এখানে এ রকম হয়।'

সুজাতা বলল, 'আপনি তো কারও সঙ্গে তেমন মেশেননি তাই জানেন না। এখানে সব কিছু হয় কিন্তু কেউ আপত্তি করে না। যে চাকরি করতে বাইরে গেছে তার বউ দেওরের সঙ্গে থাকছে। স্বামী ফিরে এলে আবার আগের মতো।'

'ঠিক আছে। তোমরা যাও।'

কাজকর্ম শেষ করে ঘড়ি দেখতেই গাড়ির আওয়াজ কানে এল। এত তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি এসে গেল? সে উঠে দরজার কাছে যেতেই পুলিশের জিপটাকে দেখতে পেল। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছু লোকজন যারা আউটডোরের সামনে ভিড় করেছিল, পুলিশ দেখেই তারা চোঁ চোঁ দৌড় দিল।

দারোগা আর একজন এস আই নামলেন জিপ থেকে। পেছন দিক দিয়ে কয়েকজন সেপাই। দারোগা ছুটন্ত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে এরা দৌড়োচ্ছে কেন?'

'নিশ্চয়ই অন্যায় করেছে। আমরা আসব আশা করেনি।'

মাথা নেড়ে দারোগা দিশার দিকে তাকালেন, 'ওরা দৌড়োচ্ছে কেন?'

'জানি না।'

'হুম। কোথায় দেখেছিলেন?'

'কাকে?'

'সেই যাকে মানবিকতা দেখিয়েছেন?'

'এখানেই।'

'সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

'থাকলেও আমার সামনে আসেনি।' দিশা বলল, 'আকাশে ঘন মেঘ থাকায় কিছুই দেখা যায়নি।'

'কোন ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?'

'ওই ঘরে।'

দারোগা উঠে এলেন ঘরে। বললেন, 'ডক্টর। পায়ে গুলি বিঁধে থাকলে কোনও মানুষ তিন-চারদিনের মধ্যে মারা যায় না। বড়জোর পা কেটে বাদ দিতে হয়। এটা জানা সত্ত্বেও আপনি কেন মানবিকতা বোধে আক্রান্ত হয়ে ওর উপকার করতে গেলেন তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এত বড় ঝুঁকি আপনি নিলেন কেন?'

'আমি জানতাম ভোর হলে আপনাদের খবর পাঠালে আপনারা ওর ব্যবস্থা করবেন। নার্সকে রিভলভার দেখিয়ে ওর সঙ্গীরা তুলে নিয়ে যাবে আমি ভাবতে পারিনি।' দিশা স্পষ্ট গলায় বলল।

'না ডক্টর, এটা কোনও যুক্তি হল না। আইন জানি না বললে সাতখুন মাপ হয়ে যায় না। এই ব্যাপারটা আর কে কে জানে?' দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন।

'রাত্রে যে নার্স ডিউটিতে ছিল সে জানে।'

'আর কেউ না? এই হেলথ সেন্টারে এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছিল তা আর কেউ জানল না? এ কী বলছেন আপনি? আরে, আপনার কথামতো, রিভলভার দেখিয়ে যখন পেশেন্টকে সাইকেলে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তো চেঁচামেচি করা যেত। পাবলিক ছুটে এলে হয়তো ওরা ধরা পড়ে যেত।' দারোগা বিশ্রী হাসি হাসলেন।

'আপনাকে আমি আগেও বলেছি, সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধের পর থেকেই লোকজন বাইরে বের হয়নি। ফলে ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন কারও দেখার কথা নয়। আর ওকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন রিভলভার দেখার পর নার্স এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। আপনি এর মধ্যে অন্য কোনও জটিলতা খুঁজবেন না প্লিজ।' দিশা বলল।

'আমার কিছু করার নেই। উগ্রপন্থীদের সাহায্য করার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারি।' দারোগা সরাসরি দিশার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন।

আর ধৈর্য রাখতে পারল না দিশা। বলল, 'ঠিক আছে। তাই করুন।'

'করব। কিন্তু তার আগে আমাকে দুটো কাজ করতে হবে ডক্টর। সেই নার্সের নাম কী যেন—, ও হ্যাঁ, নমিতা, নমিতাকে ডেকে পাঠান। ততক্ষণ আমার অফিসার আপনার আস্তানা খুঁজে দেখবে আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় কি না!'

'আপত্তিকর কিছু মানে?' দিশা অবাক হয়ে গেল।

'সেটা পাওয়ার পর দেখব। আপনার বাসা কোথায়?'

দিশা উঠে দাঁড়াল। বারান্দায় দাঁড়ানো সুজাতাকে বলল নমিতাকে খবর দিতে, এখানে আসার জন্যে। তারপর দারোগাকে বলল, 'চলুন, কী খুঁজবেন, খুঁজে দেখুন।'

'আমার আপনার যাওয়ার দরকার নেই।' দারোগা এস আইকে নির্দেশ দিতে তিনি সেপাইদের নিয়ে বীর পদক্ষেপে রওনা হলেন।

দিশা হাসল। দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাসি কেন?'

'আচ্ছা, আমার স্টেটমেন্টটা না পেলে এখন আপনি কী করতেন?'

'মানে?'

'আর যাই করতেন, এখানে তো আসতেন না!' দিশা বলল, 'খবরটা আমি না

দিলে আপনি হয়তো কখনওই জানতেন না। আমার স্টেটমেন্ট পড়ার পর মনে হয়েছে আপনার, আমাকে অ্যারেস্ট করা উচিত। তাই তো?'

'হ্যাঁ। এটাই আপনার প্লাস পয়েন্ট তাই আপনাকে এখনও অ্যারেস্ট করিনি।' দারোগার কথা শেষ হতেই নমিতা দরজায় এসে দাঁড়াল।

দিশা ডাকল, 'এসো।'

নমিতা ঢুকতেই দারোগা তার আপাদমস্তক দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম নমিতা? গুড। বাড়ি কোথায়?'

'মালদায়।'

'মালদা থেকে এতদূরে এসেছ চাকরি করতে। বাঃ, ভাল। পরশু রাত্রে যারা এসেছিল তাদের ক'জনকে তুমি চেনো?'

'আগে কাউকে দেখিনি।'

'তাই। জানাশোনা না থাকলে কেউ কাউকে সাহায্য করে?'

নমিতা মাথা নিচু করল। দারোগা ধমক দিলেন, 'চুপ করে আছো কেন? যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও।'

'আমি ওদের কাউকে চিনি না।' বেশ শক্ত হয়ে বলল নমিতা।

'বেশ, মানলাম, তুমি চেনো না। কিন্তু যখন দেখলে পায়ে গুলি ঢুকে আছে তখন লোকজনকে ডাকলে না কেন? হোয়াই?'

'আমি দিদিকে খবর দিয়েছিলাম।'

'দিদি এসে কী করল?'

'তখন ওর কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। এখানে অপারেশন হয় না তাই সাবডিভিশনে পাঠানো উচিত বলে দিদি বলেছিলেন। কিন্তু তখন ওই রাত্রে ওকে অত দূরে পাঠানোর কোনও উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে দিদিকে অপারেশন করতে হয়।'

'কী দিয়ে?'

'এখানে যা যন্ত্রপাতি আছে, তাই দিয়ে।'

'বুলেট বেরিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কোথায়?'

নমিতা একটা কৌটো থেকে বস্তুটি বের করে সামনে রাখল। দারোগা সেটা তুলে নিয়ে ভাল করে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী পরে ছিল ছোকরা?'

'প্যান্ট। হাফ প্যান্ট।'

'হাফ প্যান্ট? ওরা হাফ প্যান্ট পরে বলে শুনিনি। তারপর?'

'ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে আমাকে দেখতে বলে দিদি চলে গেলেন।'

'ঠিক করে বলো, ওর সঙ্গে কেউ ছিল কি ছিল না?'

'কাউকে দেখতে পাইনি। বারান্দায় শুয়ে ছিল।'

'নাম এন্ট্রি করেছ?'

'বলার মতো অবস্থায় ছিল না। পরে একবার বিড়বিড় করে যা বলেছিল তা এন্ট্রি করা যায় না।' নমিতা এবার চটপট কথা বলছিল।

'তারপর?'

'ভোরের একটু আগে কয়েকজন এল। আমি আপত্তি করায় রিভলভার বের করে বলল কথা বললেই খুন করে ফেলবে। ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল আমার। ওরা ওকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় আবার শাসাল। আমি অনেকক্ষণ কথা বলতে পারিনি।'

'তুমি কি তার পরেই দিদিকে গিয়ে জানিয়েছিলে?'

'না। আমি এখান থেকে বেরুতে সাহস পাচ্ছিলাম না। তারপর একজন পেশেন্টের পেইন উঠল। তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ভোরবেলায় দিদি এলে ওঁকে খবর দিলাম।'

এই সময় এস আই ফিরে এল। দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল?'

'নাঃ। বাড়িতে তেমন কিছু পাওয়া গেল না।'

দারোগা উঠে দাঁড়ালেন, 'ব্যাপারটা এত সহজ বলে আমার মনে হচ্ছে না। ডক্টর, আপনার কি মনে হয় ছেলেটা সুস্থ হয়ে যাবে?'

'চিকিৎসা না করালে ফল খারাপ হবে।'

'গুড। মনে হয় এর জন্যে ওরা আবার এখানে আসবে।' দারোগা নমিতার দিকে তাকালেন, 'এরপর যদি ও এখানে আসে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবে।'

'কী করে দেব?' নমিতা জিজ্ঞাসা করল।

'সেই ব্যবস্থা আমি করছি।' তারপর দিশার দিকে তাকালেন, 'আপনার ব্যাপারটা আমি এস পি-কে জানাচ্ছি। আপনি তো আজ বদলি হয়ে ব্লক অফিসে যাচ্ছেন। আমাকে না জানিয়ে আগামী দু' মাস কোথাও যাবেন না।'

'মাপ করবেন। পনেরো দিন পরে আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে।'

'তাই নাকি? ঠিক আছে, আমি ডক্টর রায়ের সঙ্গে কথা বলব। অবশ্য তার

আমারবই.কম

আগে যদি এস পি কোনও অ্যাকশন নিতে বলেন তা হলে ওঁকে বিরক্ত করার দরকার হবে না।' দারোগা বাইরে বেরিয়ে দেখলেন গ্রামের প্রচুর মানুষ একশো গজ দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চায় এরা?'

এস আই বলল, 'কৌতূহল। পুলিশ দেখে ভিড় করেছে।'

'দিস পিপল আর ডেঞ্জারাস। কিন্তু এদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে।'

ওঁরা গাড়িতে উঠলেন। জনতার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিপটাকে থামালেন দারোগা, 'কী? সবাই ভাল আছেন তো?' চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন।

কেউ কিছু বলল না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। দারোগা বললেন, 'পরশু এখানে ডাকাত এসেছিল। অচেনা মুখ দেখলেই ধরে রেখে আমাকে খবর দেবেন।' জিপটা চোখের আড়ালে চলে গেলে জনতা কথা বলতে শুরু করল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিশা দৃশ্যটা দেখল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পুলিশকে জনগণের বন্ধু হতে হবে।

জায়গাটা সুন্দর। কিছুটা হাঁটলেই ন্যাশন্যাল হাইওয়ে। দু'পাশে শাল-সেগুনের গাছ। এখানকার মানুষদের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল। ব্লক হেলথ সেন্টার ছাড়াও অনেকগুলো সরকারি অফিস আছে। তাদের কর্মচারীরাও এখানে থাকেন।

দিশার সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসারের নাম সাক্ষীগোপাল চাকলাদার। দরজায় লেখা এস জি চাকলাদার। বয়স হয়েছে। এক-একজন মানুষ আছেন যাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যায় কোনও ঝুটঝামেলায় জড়াতে চান না, ইনি সেই শ্রেণীর।

ডক্টর চাকলাদার বেশ আপ্যায়ন করেই বসালেন দিশাকে। বললেন, 'ভালই হল আপনাকে এখানে পেয়ে। আমি আর আপনি মেডিসিনের, একজন হোমিওপ্যাথ ছিলেন, তাঁর নাম শীতলবাবু, কিন্তু তিনি ছয়মাস আগে বদলি নিয়ে চলে গেছেন। তাঁর জায়গায় এখনও কাউকে দেওয়া হয়নি। আছেন আয়ুর্বেদের ডাক্তার গৌরাঙ্গবাবু। খুব পপুলার মানুষ। সবাই ওঁর ওষুধ খেতে চায়।'

'এখানকার লোকজন আয়ুর্বেদ পছন্দ করে বুঝি।'

'না না। গৌরাঙ্গবাবুর পোস্টটা আয়ুর্বেদের জন্যে বটে কিন্তু তিনি সব রকমের

চিকিৎসা করেন। জ্বর হলে ক্যালপল বা ক্রোসিন গুঁড়িয়ে পেশেন্টকে দেন। আমি এ সব নিয়ে মাথা ঘামাই না। মানুষের উপকার হওয়াটাই তো আসল কথা।'

ডক্টর সাক্ষীগোপাল চাকলাদারের কথা শেষ হওয়ামাত্র বেঁটে, স্বাস্থ্য ভাল, ছোট্ট গোঁফ এক ভদ্রলোক ঢুকে হাতজোড় করলেন, 'একটু দেরি হয়ে গেল। খবর পেলাম নতুন ডাক্তারদিদি এসেছেন। আমার নাম গৌরাঙ্গ।'

নমস্কার করল দিশা, 'আমি দিশা। আপনার কথাই উনি বলছিলেন।'

'আমার আর কি কথা থাকতে পারে। আপনাদের মতো বড় ডাক্তার তো আমি নই। পাঁচজনে ভালবাসে বলে টিকে আছি।'

ডক্টর চাকলাদার বললেন, 'আপনার অ্যাপ্লিকেশন আমি পেয়েছি। এ সব কী ব্যাপার বলুন তো? এ সব ঝামেলায় জড়ালেন কেন?'

'কেউ কি ইচ্ছে করে জড়ায়? জড়িয়ে যায়।' গৌরাঙ্গ বলল।

'তা ছাড়া আপনার স্টেটমেন্ট পড়ে মনে হল ওই নার্স ছাড়া কোনও সাক্ষী নেই। তা চেপে গেলেই তো পারতেন।' ডক্টর চাকলাদার বললেন।

'ডক্টর রায় আমাকে বললেন স্টেটমেন্ট দিতে, তাই—।'

'অ্যাঁ। স্যারকে আপনি চেনেন? পারসোন্যালি?'

'অল্প অল্প।'

'তা হলে ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওহো, আপনি তো গাড়ি থেকে নেমে এখানে চলে এসেছেন। চলুন আপনার বাসস্থান দেখিয়ে দিই।' ডক্টর চাকলাদার একজন পিয়নকে বললেন, 'নতুন কোয়ার্টার্সের চাবি নিয়ে গিয়ে খোলো আগে, আমরা আসছি।'

গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাডাম, আপনি কি একা থাকবেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে রান্নাবান্না, মানে সংসার সামলানো—?'

'আমার সাথে একটি মেয়ে এসেছে আগের জায়গা থেকে।'

'বাঃ। ভাল। খুব ভাল।'

পিয়নকে চলে যেতে দেখে ডক্টর চাকলাদার উঠতে যাচ্ছিলেন কিন্তু গৌরাঙ্গ তাঁকে বাধা দিল! 'আহা, আমি থাকতে আপনাকে কেন যেতে হবে। বসুন। আমি ম্যাডামকে সব দেখিয়ে দিচ্ছি।' ডক্টর চাকলাদারের মুখ দেখে মনে হল তিনি স্বস্তি পেলেন।

জিনিসপত্র নিয়ে যশোমতী দাঁড়িয়ে ছিল। আজ তার পরনে একটি পরিষ্কার

আমারবই.কম

জামা। এটি সম্প্রতি দিশা তাকে উপহার দিয়েছে। গৌরাঙ্গ বলল, 'এ তো পুঁচকে মেয়ে।'

'কিন্তু খুব কাজের মেয়ে।' দিশা বলল।

দেখেই বোঝা যায় বাড়িটা বেশি দিন আগে তৈরি হয়নি। দুটো বড় ঘর, কিচেন, খাওয়ার জায়গা, পেছনে পাঁচিলঘেরা এক চিলতে উঠোন। বাথরুম ঝকঝকে। দেখে খুব পছন্দ হল দিশার। হেলথ সেন্টার থেকে পাওয়া দুটো খাট, দুটো টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার ছাড়াও একটা দেওয়াল আলমারি রয়েছে বাড়িতে।

গৌরাঙ্গ বলল, 'আপনার এখানকার ব্যবস্থা বড় ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে অনেক ভাল।'

'ওমা। তা হলে উনি এখানে এলেন না কেন?'

'উনি যেখানে বসেন সেখান থেকে নড়েন না। আবার জিনিসপত্র সরাতে হবে—।' বলে হেসে ফেলল গৌরাঙ্গ, ' কিন্তু আজ আপনার খাওয়া দাওয়া কী হবে?'

'আমার সঙ্গে সব ব্যবস্থা আছে।'

'ব্যবস্থাটা কালকের জন্য থাক না, আজ এই অধমকে দায়িত্ব দিন।'

'না না। এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।' দিশা বলল, 'এখানে ঠিক কখন আউটডোর শুরু হয়?'

'সাড়ে আটটায়। আজ আর আপনাকে যেতে হবে না। না না। যাবেন। গিয়ে জয়েনিং রিপোর্ট দিয়ে সই করে আসবেন।' গৌরাঙ্গ চলে গেল।

লোকটাকে মন্দ লাগল না। হেলথ সেন্টারের পিয়ন যাবতীয় জিনিসপত্র দিল। যশোমতী ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছে কোথায় কী রাখতে হবে, সেইমতো রাখা হল।

পিয়নটি বলল, 'দিদি, আমার নাম মাধব। আপনি আসায় এখানকার মেয়েদের খুব উপকার হবে। আমার বউকে আমি হেলথ সেন্টারে আনতে পারব।'

দিশা ব্যাপারটা বুঝতে পারল না, অবাক হয়ে তাকাল।

'আসলে ব্যাটাছেলে ডাক্তারের কাছে কোনও মেয়ে নিজেদের দেখাতে চায় না। আমরা সবাই বউয়ের অসুবিধেগুলো জেনে এসে গৌরাঙ্গদার কাছে বলি, তিনি ওষুধ দেন।'

'ও। নিশ্চয়ই, নিয়ে আসবে ওদের। তোমরা গৌরাঙ্গডাক্তারকে দাদা বলে ডাকো?'

'হ্যাঁ। বাচ্চাবুড়ো সবাই।' মাধব চলে যেতে যেতে আবার দাঁড়াল, 'আপনার যখন যা লাগবে আমাকে বলবেন। লজ্জা করবেন না। রান্নার গ্যাস দেখলাম, বাজার আছে!'

'আছে।' হাসল দিশা। মাধব চলে গেল।

এই বাড়িটার মতো এখানকার মানুষগুলোও বেশ ভাল। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'এই যে যশোমতী, কেমন লাগছে নতুন বাড়ি?'

'খুব ভাল।' দাঁত বের করে হাসল যশোমতী।

হঠাৎ দিশার মনে হল মেয়েটাকে এখানকার স্কুলে ভরতি করে দেওয়া উচিত। ও যদি স্কুলের শেষ ধাপ পর্যন্ত যেতে পারে তা হলে নার্সিং-এর সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। নিঃস্ব পরিবারে জন্মেছে বলে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হবে কেন? ওর কী দোষ?

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়িঘর গোছানো হয়ে গেল। ক্যালেন্ডারটা টাঙাল একেবারে সামনের দেওয়ালে যাতে ঘুম ভাঙলেই দেখতে পারে। হাতমুখ ধুয়ে সে বলল, 'মা যশোমতী এক কাপ চা করে দিতে পারবি?'

'হ্যাঁ।' চলে গেল মেয়েটা।

বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ভাবনাগুলো চলে এল। এস পি যদি দারোগাকে অ্যারেস্ট করতে বলেন তা হলে কী হবে? বিনা বিচারে আটক করা যেতে পারে না। নিশ্চয়ই কোর্টে তুলবে। তখন সে তার কথা বলার সুযোগ পাবে। সূর্য নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে এসে উকিলের ব্যবস্থা করবে। খবরটা কাগজে বেরুবে। হয়তো রায় না বেরুনো পর্যন্ত ডিপার্টমেন্ট তাকে সাসপেন্ড করতে পারে। কী করা যাবে। সে এখনও মনে করে কোনও অন্যায় কাজ করেনি। কিন্তু তাকে অ্যারেস্ট করা হল না শুধু এই জায়গা ছেড়ে না যাওয়ার আদেশ দেওয়া হল। তখন?

অসম্ভব! সে ও রকম আদেশ মানতেই পারে না। আর চোদ্দো দিনের মাথায় সূর্যর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা কলকাতায় গিয়ে। দেখা না করে সে পারবেই না।

চা খেয়ে শাড়ি পালটে সে যশোমতীকে নিয়ে বের হল। জায়গাটা ঘুরে দেখা দরকার।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরেই পোস্টঅফিস। পোস্টঅফিসে টেলিফোন নেই। একজন বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, আছে, তবে এখন খারাপ হয়ে রয়েছে। মাসে দু'-তিনদিন ভাল থাকে।

ওপাশে পি ডব্লু ডির অফিস। পাশে ফরেস্টের বিট অফিস। এখন রোদ মরে এসেছে। হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল। বেশ গাছগাছালি। আর আশ্চর্য! মাটি তেমন পিছল নয়। এদিকে বোধহয় রাস্তা তেমন কাদায় ভরে থাকে না।

যশোমতী বলল, 'ওই যে দোকান।'

দিশা দেখল মুদির দোকানটা মাঝারি সাইজের। সে এগিয়ে গেল। মোটামুটি সব জিনিসই আছে। ম্যাগিও ঝুলছে। দোকানদার ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। সে বলল, 'নমস্কার। আমি আপনাদের এখানে আজই এলাম। হেলথ সেন্টারের ডাক্তারের চাকরি।'

'ও তাই নাকি? বাঃ, খুব ভাল হল। আমাদের এখানে কোনও লেডি ডাক্তার নেই।'

'শুনলাম তাই।'

'আমার এখানে পাঠিয়ে দেবেন, যখন যা লাগবে দিয়ে দেব। যদি চান খাতাও খুলতে পারেন। দামি কিছু হলে একটা দিন আগে বলতে হবে, শহর থেকে আনিয়ে দেব।'

'খুব ভাল। না। যা নেওয়ার এখানেই নেব। যাই একটু ঘুরে দেখি।'

'এখানে দেখার তো কিছু নেই। ওদিকে জাতীয় সড়ক আর বনজঙ্গল। হ্যাঁ, ওপাশে একটা বড় ঝিল আছে, গিয়ে দেখতে পারেন। বেশ সুন্দর।'

'কোনদিকে?'

'ডানদিকের রাস্তা ধরে মিনিট দশেক গেলেই দেখতে পাবেন। তবে সন্ধের আগেই ফিরে আসবেন। অনেকে ভয় পেয়েছে।'

'কীসের ভয়?'

'আমি দেখিনি। বলে জলার ভূত বের হয়।'

হেসে ফেলল দিশা। তারপর ডানদিকের রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করল। পাশে হাঁটছিল যশোমতী। হঠাৎ সে মিনমিনে গলায় বলল, 'ও দিদি, ওদিকে যেয়ো না।'

'কোনদিকে?'

'ওই যে ভূত বের হয়।'

'ভালই তো, তোর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব।'

'না।' খপ্ করে হাত ধরল যশোমতী।

'দূর পাগল। ভূত বলে কিছু নেই। তুই তো আমার সঙ্গে আছিস, ভয় কী?'

ঝিল চোখে পড়ল। বেশ বড়। ওদিকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। রোদ চলে

যাওয়ায় জলের রং এখন স্লেটের মতো। আস্তে আস্তে কালো হবে। চওড়ায় বড় জোর আশি গজ। এদিকে কোনও মানুষের বাড়ি নেই। প্রচুর পাখি উড়ছে ঝিলের ওপর। মাছরাঙারা ছোঁ মারছে জলে। ঝিলের পাশ দিয়ে হাঁটছিল ওরা। যশোমতী আরও আড়ষ্ট।

হঠাৎ কানে এল কেউ কথা বলছে। যশোমতী দু'হাতে জড়িয়ে ধরল দিশার হাত। দিশা কান পেতে শুনল। না কথা নয়, কবিতা, কেউ আবৃত্তি করছে। সে আর একটু এগোল। এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে আবৃত্তি—'হাট ভেঙ্গে গেলে মারুয়ার খর গন্ধে কেউ কেউ/ ভাঙ্গা দোচালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিল/ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে হাঁটুমুড়ে সোনালী আপেল/ টমোটোর লাল খেতে বুঁদ হয়ে শুয়ে আছে আখুটে বিড়াল/ গত সপ্তায় ফিরে যাওয়া হাটবাবু সেই রাত্রে বাসে চেপে ফেরেনি শহরে।' এ রকম কবিতা কখনও শোনেনি দিশা। কার কবিতা? সে আর একটু এগোতেই অবাক হয়ে গেল।

মেয়েটি একা। পরনে আটপৌরে নীল রঙের শাড়ি। পেছন থেকেই বোঝা যাচ্ছে ওর শরীর খুবই শীর্ণ। যশোমতী বলল, 'দিদি, ওই যে!'

মানুষের গলা কানে যাওয়ামাত্র মেয়েটি মুখ ফেরাল। এত মিষ্টি মুখ অনেকদিন দ্যাখেনি, চোখ দুটো চমৎকার উজ্জ্বল। বসে ছিল মেয়েটি ; এবার উঠে দাঁড়াল।

দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কার কবিতা? আপনি লিখেছেন?'

খুব লজ্জা পেয়ে গেল মেয়েটি, 'না না। কবিতা লেখার ক্ষমতা আমার নেই। এটা তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন।'

'তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়?'

'উত্তর বাংলায় থাকেন। ওঁর কবিতা আমার ভাল লাগে।'

'আমারও লাগল। আমি এখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার হয়ে আজ এসেছি। আমার নাম দিশা।' দিশা হাসল।

'দিশা? বাঃ। সুন্দর নাম।'

'আপনি?'

'এখানকার জুনিয়ার স্কুলে পড়াই। আমি সুচেতনা।'

দিশা হেসে ফেলল। সুচেতনার ভ্রূ সামান্য বেঁকে গেল, 'হাসলেন কেন?'

'আপনি বিকেলের নক্ষত্রের কাছে দূরতর দ্বীপ হতে পারেন কিন্তু আমার কাছে খুব কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে।' দিশা বলল।

'আপনি কবিতা পড়েন? উঃ, কী ভাল লাগছে। একজন বন্ধু পাওয়া গেল।'

আমারবই.কম

'বন্ধু?'

'কবিতা মানুষকে মানুষের পাশে এনে দেয়।' বলেই হঠাৎ জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। দু'হাতে বুক আঁকড়ে ধরে মুখ হাঁ করে বাতাস টানতে লাগল। ওর রোগা গলার শিরা নীল হয়ে উঠেছে। দিশা ছুটে গেল, 'কী হয়েছে? আপনার কী হয়েছে?'

সেই অবস্থায় এক পলকের জন্য ডানহাত সরিয়ে নিঃশব্দে কিছু হয়নি বুঝিয়ে সে হাঁপাতে লাগল। তারপর ব্যাগ খুলে দ্রুত ইনহেলার বের করে মুখে পাম্প করতে লাগল। চার-পাঁচবার পাম্প করার পর একটু শান্ত হয়ে ফ্যালফ্যাল করে সুচেতনা তাকিয়ে থাকল হাতে ধরা ইনহেলারটির দিকে, 'কী হবে?'

দিশা ওর পাশে এসে বসল। ইতিমধ্যে সে বুঝে গিয়েছে। সুচেতনা মারাত্মক অ্যাজমায় ভুগছে। নিশ্চয়ই এই আক্রমণ মাঝেমাঝেই হয়। এ রকম অবস্থায় হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদিও লোকের ধারণা অ্যাজমা-রোগীরা সহজে মারা যায় না। সে সুচেতনার পিঠে হাত রাখল। এখনও থর থর করে কাঁপছে। দিশা কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে পিঠে ম্যাসাজ করে দিতে লাগল। মিনিট দশেক বাদে সুচেতনা হাসল। ঠিক হয়ে গেছে। আপনার হাতে দেখছি জাদু আছে। অবশ্য এর আগে কেউ কখনও আমার পিঠে ম্যাসাজ করেনি।'

'কতদিন ধরে চলছে?'

'আগে মাসে মাসে হত। বাড়াবাড়ি হচ্ছে মাস দুয়েক।'

'চিকিৎসা করাচ্ছেন না?'

'হুঁ। কোনও লাভ নেই। আগে গৌরাঙ্গবাবু ওষুধ দিতেন। কোনও কাজ হত না। তারপর ডক্টর চাকলাদার বাড়াবাড়ি হলে ইঞ্জেকশন দিত। তাতে খুব সাময়িক আরাম হত। একবার সাবডিভিশনাল হাসপাতালের ডক্টর রায় এসেছিলেন। তাঁকে দেখিয়েছিলাম। উনি যে সব ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন তা সদর থেকে আনিয়েছিলাম কিন্তু কোনও কাজ দেয়নি। শুধু এই বস্তুটি থেকে মুখে পাম্প করে ওষুধ দিলে কিছুক্ষণ আরাম হয়। এটাও আজ শেষ হয়ে গেল। মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত কিনতে পারব না।'

সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছে। জলের রং কালো হচ্ছে। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখন হাঁটতে পারবেন?'

'পারব।' হাসল সুচেতনা, 'আপনি তো মেয়ে, জানেন না, এদেশের মেয়েরা সব পারে।' সুচেতনা উঠে দাঁড়াতে দিশাও উঠল।

'এ কে?' সুচেতনা জিজ্ঞাসা করল।

'ও যশোমতী। আমার সঙ্গে আছে। ওর খুব ভূতের ভয়।'

সুচেতনা এগিয়ে গিয়ে যশোমতীর মাথায় হাত দিল, 'ভূতকে ভয় করার কিছু নেই। ভূতরা খুব ভাল হয়।'

'ভূতরা ভাল হয়?' যশোমতী বিস্মিত।

'হ্যাঁ। কোনও কোনও মানুষ যারা খুব খারাপ, তাদেরই ভয় করা উচিত।' বলে দিশাকে বলল, 'একে প্রাইমারি স্কুলে ভরতি করে দিন।'

'হ্যাঁ, তাই ভেবেছি। চলুন, অন্ধকার ঘন হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি এখানে এসে আবৃত্তি করছিলেন কেন?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।

'আবৃত্তি করার জন্যে এখানে আসিনি। আসার পর আজ হঠাৎ কবিতাটা মনে পড়ল। তুষারদাকে আমি সেই ছেলেবেলা থেকে চিনি।'

'আচ্ছা।'

'হ্যাঁ। বীরপাড়া স্কুলে পড়াতেন। সারাটা জীবন বিশৃঙ্খল ভাবে কাটিয়েছেন। একসময় শরীর নানান অত্যাচারে ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু কবিতা লেখার সময় ওর কলমে দৈবশক্তি ভর করত।'

'দৈবশক্তি?'

'হ্যাঁ। দেবতা মানুষের কথা বলতে বাধ্য হতেন।'

ওরা চুপচাপ হেঁটে আসছিল। রাস্তা চেনা এখন মুশকিল হচ্ছে। সুচেতনা বলল, 'আসলে এই জায়গায় এলে আমার মন ভাল হয়ে যায়। তা ছাড়া জলের ওপর দিয়ে যখন বাতাস বয়ে যায় তখন ছোট ছোট ঢেউ ওঠে বিলে। কী চমৎকার। আর ওই নির্মল বাতাস বুক ভরে নিতে নিতে মনে হয় আমার অ্যাজমা সেরে যাবে।'

'এখানে আপনি কোথায় থাকেন?'

'পোস্ট অফিসের পেছনে। আর একজন টিচারের সঙ্গে ঘর শেয়ার করে আছি।'

'আপনার আত্মীয়স্বজন?'

'সবাই বীরপাড়ায়। এখানে চারবছর হয়ে গেল। অনেক কষ্টে চাকরিটা পেয়েছি কিন্তু রাখতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

'কেন?'

'যখনই টান ওঠে এত কাহিল হয়ে পড়ি যে ক্লাস করতে পারি না। হেডমাস্টার এটা কতদিন সহ্য করবেন?' বলেই সুচেতনা তাকাল দিশার দিকে। 'আজও তো টান উঠল কিন্তু শরীর তেমন খারাপ লাগছে না। একটু ঝিমঝিম করছে শুধু।'

'আপনি একা থাকেন এখানে?'

'এ্যাঁ। হ্যাঁ।'

ওরা মুদির দোকানের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। দিশা বলল, 'এক মিনিট দাঁড়াবেন, আমি একটু ওই দোকান থেকে আসছি।'

দিশা দেখল দোকানে এখন বেশ ভিড়। দু'জনকে জিনিসপত্র দেওয়ার পর দোকানদার তাকে দেখতে পেল, 'ঘুরে এলেন?'

'হ্যাঁ। বেশ সুন্দর। আচ্ছা, আপনি একটা ওষুধ শহর থেকে আনিয়ে দিতে পারবেন?'

'কাল বিকেলে হয়ে যাবে, যদি পাওয়া যায়।'

'এটা না পাওয়ার কোনও কারণ নেই।'

'লিখে দিন।' একটা কাগজ আর কলম এগিয়ে দিল দোকানদার। ওষুধের নাম এবং একশোটা টাকা আগাম হিসেবে দিয়ে ফিরে এল দিশা।

পোস্টঅফিসের সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন লাগছে?'

'অনেকটা ভাল।' সুচেতনা বলল, 'ওমা, আপনি কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসাই করা হয়নি।'

'হেলথ সেন্টার থেকে আমাকে একটা থাকার জায়গা দেওয়া হয়েছে। পাশেই। যখনই সময় পাবেন নিঃসংকোচে চলে আসবেন।'

'দেখুন, পরে বিরক্ত হবেন না তো!'

'আমি আর এই পুঁচকেটা থাকি, এসে দেখুন না!' দিশা হাসল।

'আপনাকে আমার ওখানে যেতে বলতে পারছি না। যে ভদ্রমহিলা আমার রুমমেট তিনি গেস্ট একদম পছন্দ করেন না।'

'কেন?'

'জানি না। তা ছাড়া উনি ভয়ংকর পুরুষবিদ্বেষী।'

দিশা বলল, 'কেউ কেউ ও রকম হয়। আচ্ছা, চলি।'

যশোমতীর জন্যে মশারি কিনতে হবে। ওখানে থাকতে ও রাত্রে বাড়ি চলে যেত, শোওয়ার সমস্যা ছিল না। যদিও যশোমতী আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়েছে তবু সতর্ক হওয়া ভাল। মেঝেতে বিছানা করে শোওয়া যশোমতীর দিকে তাকিয়ে দিশার মনে হল ওকে অন্য ঘরটায় শুতে বলা উচিত ছিল। সূর্য যখন

আসবে তখন বলার চেয়ে এখন থেকেই ওকে আলাদা শুতে অভ্যস্ত করানো উচিত।

চোখ বন্ধ করতেই রোজ সূর্যর মুখ দেখতে পেত। কিন্তু আজ সুচেতনার যন্ত্রণায় বেঁকে যাওয়া মুখ ভেসে উঠল। মেয়েটার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বয়সে তার চেয়ে দু'-তিন বছরের বড়ই হবে। একা থাকার কথা বলতে সুচেতনা যেন চমকে উঠেছিল একটু, তারপর বলেছিল, হ্যাঁ। কেন? মেয়েটার মুখ কি মিষ্টি। চোখ দেখলেই মনে হয় গভীর মনের মেয়ে। কিন্তু শরীর? এত রোগা যে একটা দেশলাইকাঠির কথা মনে আসে। গলা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনও ঢেউ নেই। শুধু মুখ দেখে কি কোনও ছেলে ভালবাসবে?

ঠিক সময়ে হেলথ সেন্টারে পা রাখল দিশা। ডক্টর চাকলাদার তাঁর ঘরে বসে ছিলেন। দেখামাত্র বললেন, 'চলুন, আপনাকে আউটডোরে নিয়ে যাই। আজ থেকে তো কাজ শুরু করতে হবে।'

'গৌরাঙ্গবাবু নেই?'

'নেই মানে? দেখছেন না, এর মধ্যে লোক জমে গেছে।'

'তা হলে আপনাকে যেতে হবে না, উনি বলে দেবেন কী করণীয়।'

ডক্টর চাকলাদার যেন স্বস্তি পেলেন। উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'বেশ তো। এখন থেকে হেলথ সেন্টার তো আপনারও।'

আউটডোরে ঢুকতেই গৌরাঙ্গ উঠে দাঁড়াল, 'আসুন আসুন ম্যাডাম। এই যে, এই আপনার টেবিল চেয়ার।' তারপর চিৎকার করে ডাকল, 'মাধব, মাধব।'

মাধব ছুটে এল। গৌরাঙ্গ বলল, 'বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের বলে দাও আজ থেকে ম্যাডাম পেশেন্ট দেখবেন। খবরটা যেন গ্রামের সবাই জানতে পারে।'

মাধব বেরিয়ে গেল। তারপরেই দিশার কানে এল মাধবের চিৎকার, 'শুনুন আপনারা সবাই মন দিয়ে শুনুন। কলকাতা থেকে নতুন ডাক্তার দিদিমণি এসেছেন। তিনি আজ থেকে আপনাদের চিকিৎসা করবেন। মা ও বোনেরা আর সংকোচ করবেন না। শুনুন, শুনুন।'

গৌরাঙ্গ হাসল, 'রকম দেখুন। যেন সিনেমায় বিজ্ঞাপন ঘোষণা করছে। বসুন ম্যাডাম।' একজন নার্স এসে কাগজপত্র কলম টেবিলে রেখে দিয়ে হাসল, 'আমি রেখা।'

আমারবই.কম

'ও। কী রকম ভিড় হয় এখানে?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।

'হয়। তবে দাদা একাই সামলে নেন।'

ওদিকে তখন একজন পেশেন্টকে দেখছে গৌরাঙ্গ। নাড়ি দেখে বলল, 'খাওয়াদাওয়া এবার কন্ট্রোলে আনতে হবে হে। অত গরম মশলা দেওয়া খাবার খাওয়া চলবে না। অসুবিধে কী হয়?'

'সবসময় পেট ভুটভুট করে। বাতাস হয়।'

'আয়ুর্বেদে খুব ভাল ওষুধ আছে। কিন্তু ওষুধে কী হবে যদি সংযম পালন না কর। ঠিক আছে, অন্য ওষুধ দিচ্ছি, দু'দিন পরে এসে বলবে কেমন আছো। দু'বেলা খাওয়া দাওয়ার পর একটা করে ট্যাবলেট খাবে।' কাগজে ওষুধটার নাম লিখে লোকটার হাতে দিয়ে বলল, 'কাউন্টারে এটা দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে যাও। পরের জন!'

আধঘণ্টা চুপচাপ কেটে গেল। দিশা গৌরাঙ্গকে দেখছিল। যারা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তারা গৌরাঙ্গকেই দেখাতে চায়। আর গৌরাঙ্গের চাকরি আয়ুর্বেদের ডাক্তার হিসেবে কিন্তু দিয়ে যাচ্ছে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ। ক্যালপল, ক্রোসিন থেকে সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক, কিছুই বাদ দিচ্ছে না। অথচ এগুলো ওর দেওয়ার কথা নয়।

মাঝেমাঝে গৌরাঙ্গ হাঁকছে, 'আমার কাছে দেখাতে আপনাদের অনেক সময় লাগবে। যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা ওঁর কাছে যান।'

কিন্তু তাতে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না।

ঘন্টাখানেক বসার পর একটি বাচ্চাকে নিয়ে তার মা এল। এই দিশার প্রথম পেশেন্ট। বেশ জ্বর বাচ্চাটার। নার্সকে বলল দিশা টেম্পারেচার নিতে। বগলে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দেখা গেল একশো চার।

দিশা বলল, 'এত জ্বর, ওকে কি আপনি হাঁটিয়ে এনেছেন?'

'কী করব!'

'আশ্চর্য! কত দূরে থাকেন?'

'ঝিলের ওপাশে।'

'সর্বনাশ। আমাদের খবর দেওয়া উচিত ছিল আপনার।'

'টাকা নেই, গেলে টাকা দিতে হয়—'

থাপ্পড় খেল যেন দিশা। তারপর রেখাকে বলল, 'আমাদের কোনও বেড খালি আছে? থাকলে একে ওখানে শুইয়ে দাও। আমি আসছি।'

'শুধু জ্বরের জন্যে এখানে বেড দেওয়া হয় না।' নার্স বলল।

'সেটা আমি বুঝব। এসো ওকে নিয়ে।' দিশা উঠল।

একটা ঘরে ছ'টা খট। দু'জন পেশেন্ট শুয়ে আছে, চারটে খাট খালি। তার একটায় ছেলেটাকে শোওয়াতেই সে চোখ বন্ধ করল। দিশা নার্সকে বলল, 'এখানে ডিউটিতে কে আছে?'

'কমলা। ওর শরীর খারাপ বলে আসেনি।'

'অন্য কেউ ওর ডিউটি করছে না?'

'আমিই দু'দিক সামলাচ্ছি দিদি।'

'এখানে তো সামলাবার কিছু নেই। এক বালতি জল আনো। এনে ওর মাথা ভাল করে ধুয়ে মুছিয়ে গা ভেজা তোয়ালে দিয়ে স্পঞ্জ করে দাও।' দিশা হুকুম করল।

রেখার তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু গলার স্বর শোনার পর আর আপত্তি করল না।

দিশা বাচ্চার মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে থেকে জ্বর এসেছে?'

'পরশু।'

'ওষুধ খাওয়াননি?'

'কাল গৌরাঙ্গদা ওষুধ দিয়েছিল, কমেনি।'

'সবসময় এমন গা-পোড়া জ্বর থাকছে?'

'না। মাঝেমাঝে কমছে, আবার শীত করছে তারপর জ্বর বাড়ছে।'

'আমি ওকে ওষুধ দিচ্ছি। কিন্তু ওর রক্ত পরীক্ষা করা দরকার। বাড়িতে কে আছে?'

'ওর দাদা আছে।'

'কত বয়স?'

'কুড়ি।'

'ওকে ডেকে আনুন। এখনই।'

মহিলা চলে গেল। দিশা দেখল শরীর স্পঞ্জ করিয়ে দেওয়ার পর বাচ্চাটা একদম ঘুমিয়ে পড়েছে। ডিসপজেব্‌ল সিরিঞ্জ আনিয়ে ওর শরীর থেকে কিছুটা রক্ত বের করে ছোট্ট শিশিতে ভরল দিশা। এই বাচ্চাকে সাবডিভিশন্যাল হসপিট্যালে নিয়ে যাওয়া মানে কষ্ট দেওয়া। শুধু রক্ত পরীক্ষার জন্যে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

মহিলা ফিরে এল একটি তরুণকে নিয়ে। দিশা তাকে বলল, 'ভাই, তুমি এখনই সাবডিভিশন্যাল হসপিট্যালে চলে যাও। সেখানে গিয়ে এই শিশিটা দিয়ে রক্ত পরীক্ষা করতে বলবে। আমি সঙ্গে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। ওরা যদি কোনও

আমারবই.কম

অসুবিধের কথা বলে তা হলে ভাল করে অনুরোধ করবে। তা-ও যদি না শোনে তা হলে ডক্টর রায়ের কাছে গিয়ে আমার এই চিঠিটা দেখাবে। যা বললাম, মনে থাকবে?'

তরুণ মাথা নাড়ল। শিশি এবং চিঠি নিয়ে চলে গেল। এইসময় গৌরাঙ্গ এই ঘরে এল, 'জ্বর কত ম্যাডাম?'

'অনেক। কাল কী ওষুধ দিয়েছিলেন।'

'ক্যালপল। ভেবেছিলাম সাধারণ জ্বর হলে কমে যাবে। কিন্তু লক্ষণ দেখে আমারও সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু সিওর না হয়ে ম্যালেরিয়ার ওষুধ কী করে দিই বলুন।'

'আপনি ঠিকই করেছেন। কিন্তু এখানে, অন্তত ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। যা হোক, জ্বর কমাবার জন্যে ওকে ক্রোসিন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রেখা, রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত ও এখানে থাকবে। আমি ডক্টর চাকলাদারের সঙ্গে কথা বলছি।' দিশা বলল।

গৌরাঙ্গ বলল, 'না না। এখানেই থাক ও। বেড তো এখনও খালি আছে।'

'আপনার রোগী দেখা শেষ?'

'হ্যাঁ।'

'লোকে দেখছি আপনার ওপর খুব আস্থা রাখে।'

'আয়ুর্বেদ করলে হয় তো রাখত না। আমি জানি অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দেওয়া আমার উচিত নয়। তবে সামান্য জটিল কেস হলেই তো আমরা সাবডিভিশন অথবা সদরে পাঠিয়ে দিই। আমি যা দিই তা খুবই সাধারণ। তাতেই বেশির ভাগের অসুখ সেরে যায়। তবে আপনি যখন এসে গিয়েছেন তখন আমি আর ধর্মচ্যুত হব না।' গৌরাঙ্গ হাতজোড় করল।

দিশা কী বলবে বুঝতে পারল না। এতদিন যা চলে আসছে তা তো সবাই মেনে নিয়েছে। ঠিক না হলেও বেঠিক বলে মনে হয়নি কারোর। অতএব সে বলল, 'আমি কিছু বলছি না। ডক্টর চাকলাদার যখন মেনে নিয়েছেন তখন যা চলছে তাই চলুক।'

গৌরাঙ্গ মাথা নাড়ল, 'না না। আপনার যদি আপত্তি থাকে তা হলে আমি বন্ধ করে দিতে পারি। এতে তো আমারই লাভ, পরিশ্রম একদম কমে যাবে। শেকড়বাকড় খেয়ে তো এরা অসুখ সারাতে চায় না। এখন সবাই ম্যাজিক চায়।'

কথাটা ঠিক। এই যে বাড়তি দায়িত্ব নিচ্ছে গৌরাঙ্গ, যেটা নেওয়ার অধিকার তার নেই, তা না নিলে ওর প্রায় কোনও কাজই থাকবে না। যে কোনও ফাঁকিবাজ

লোক এই সুযোগ ছাড়ত না। এখন প্রশ্ন হল, ডক্টর চাকলাদার আউটডোরে বসেন কি না। কিন্তু প্রথম দিনেই এই অপ্রিয় প্রশ্ন তুলে জলঘোলা করা ঠিক নয়।

দিশা বলল, 'আপনি তো জানেন একজন পেশেন্টকে কী ওষুধ আপনি দিতে পারেন। আমি যেমন সার্জন নই কিন্তু বাধ্য হলে ছোটখাটো অপারেশন আমাকে করতে হবে। আমি ব্যাপারটাকে এ রকমই ভাবছি। সামান্য জটিল বুঝলে আমাকে বলবেন।'

'অবশ্যই।' গৌরাঙ্গ মাথা নাড়ল।

দুপুরের পরে রিপোর্ট নিয়ে ফিরল ছেলেটা। তার ভাইয়ের ম্যালেরিয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার ওষুধ দেওয়া হল। ডক্টর চাকলাদার বললেন, 'রক্ত পরীক্ষা করিয়ে ভালই করেছেন। তবে সবাই তো এ রকম সাহায্য করে না। দু'-তিনদিনের জ্বরে যদি ম্যালেরিয়ার সিমটম থাকে তা হলে পরীক্ষা ছাড়াই ওষুধ দেওয়া হয়। ভালও হয়ে যায়।'

বিকেলে আবার হেলথ সেন্টারে গিয়ে দেখল কয়েকজন অপেক্ষা করছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ওরা জানাল গৌরাঙ্গর সঙ্গে ওদের দরকার। গৌরাঙ্গ যে বেশ জনপ্রিয় তা বোঝা যাচ্ছে। দিশা বাচ্চাটাকে দেখল। জ্বর এখন একশোতে নেমেছে। কিন্তু আবার বাড়বে। ওর মা ঠায় বসে আছে বিছানার পাশে। দিশা বলল, 'আপনি এবার বাড়ি যান।'

'ওকে কে দেখবে?'

'কেন? আমরা আছি কী করতে?'

'না—মানে, শুধু জ্বরের জন্যে তো এখানে রাখে না।'

'সাধারণ জ্বর হলে রাখে না, ম্যালেরিয়া হলে রাখতে হবে। এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।' রেখার জায়গায় যে মেয়েটি নার্সিং করতে এসেছে তাকে বাচ্চাটার ব্যাপারে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিল দিশা।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই গৌরাঙ্গর গলা পেল। তার পোশাক বদলে গেছে। মনে হচ্ছে কোথাও যাবে। ওকে দেখে এগিয়ে এল গৌরাঙ্গ, 'শহরে যাচ্ছি, কিছু আনতে হবে?'

চট করে ইনহেলারের কথা মনে পড়ল। সেটা তো আজ বিকেলেই দোকানদার এনে দেবে। সে বলল, 'না। অনেক ধন্যবাদ।'

'দূর। এর জন্যে ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন?'

'আচ্ছা গৌরাঙ্গবাবু, ক্রনিক ডিজিস, যেমন ধরুন অ্যাজমা, আপনাদের ওষুধে সারে? এ রকম কোনও কেস পেয়েছেন?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল গৌরাঙ্গ, 'না ম্যাডাম। সাময়িক আরাম হয় কারও কারও। কিন্তু সেরে উঠেছে এমন কেস পাইনি। আচ্ছা—।'

'হঠাৎ শহরে? কোনও কাজ আছে?'

'না না। এরা আমাকে আজ সিনেমা দেখাবে, তাই—।'

বেশ অবাক হয়ে গেল দিশা। সিনেমা দেখাবে গ্রামের ছেলেরা? তার মানে গৌরাঙ্গর সঙ্গে এদের সম্পর্ক শুধু ডাক্তার-পেশেন্টের নয়। খুব ভাল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ফিরতে তো রাত হয়ে যাবে। কী ভাবে ফিরবেন?'

'যে কোনও একটা ট্রাকে উঠে পড়ব।' হেসে চলে গেল গৌরাঙ্গ।

বাড়ি ফিরে এসে দিশা খুশি হল। দোকানদার ইনহেলার পাঠিয়ে দিয়েছে। দামের কথা কিছু লিখে দেয়নি। একবার ভাবল যশোমতীকে পাঠিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে সঠিক দাম জেনে নিলে হয়। তারপর মনে হল, না। মেয়েটাকে এখনই অত দূরে পাঠানো ঠিক নয়।

কয়েকটা জিনিসের প্রয়োজন ছিল। যশোমতীকে সঙ্গে নিয়ে বের হল দিশা। এখন সন্ধে নেমে আসছে। এই সময়টা এলেই মন খারাপ হয়ে যায়। কথা বলতে চাইল দিশা, 'এই, এখানে তো একদিন হল, কেমন লাগছে তোর?'

'ভাল। দাদাবাবু কবে আসবে?' যশোমতী মুখ তুলল।

'অ্যাঁ? সেকী রে! এই তো গেল? কেন?'

'আসার সময় আবার ইলিশ মাছ আনবে?'

মেয়েটার দিকে তাকাল দিশা। ওর মাথায় যে ইলিশ ছাড়া অন্য ভাবনা নেই তা সে বুঝতেই পারেনি। বলল, 'ঠিক আছে, আমি তো তার আগে যাব, আমিই নিয়ে আসব।'

'তা হলে আনার দরকার নেই।'

'কেন? আমি আনলে খাবি না?'

'তা কেন? আমি তো ওখানে গেলে খেতে পাব। আনতে হবে কেন?'

চুপ করে গেল দিশা। সে কলকাতায় গেলে যশোমতীকে ওর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবে, এটাই স্বাভাবিক। ও যে তার সঙ্গে কলকাতায় যেতে চাইতে পারে ভাবেনি। মুখে কিছু বলল না দিশা।

দোকানদার বলল, 'এটা গ্লাক্সো কোম্পানির তাই একটু বেশি দাম। আপনি আমাকে কুড়িটা টাকা দিন।'

'অন্য কোম্পানির দাম কী রকম?

'আশি টাকার মধ্যে। তবে এটা বেশি ভাল।'

টুকটাক জিনিসগুলো কেনা হলে টাকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দূরে সুচেতনাকে দেখতে পেল সে। ঝিলের দিক থেকে হেঁটে আসছে। হাঁটার ভঙ্গি বলে দিচ্ছিল ওর শরীর ভাল নেই। দিশা এগিয়ে গেল। ওদের দেখতে পেয়ে সুচেতনা হাসল। আবছা আলোতেও ওর মুখ আরও সুন্দর হয়ে উঠল।

'বেড়াতে গিয়েছিলেন?'

'হুঁ।'

'এখন?'

'বাড়িতে বসে থাকব।'

'তার চেয়ে চলুন আমার ওখানে।'

'অসুবিধে হবে না তো?'

'বিন্দুমাত্র না। আসুন।'

বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রোজ ঝিলের দিকে যান?'

'অ্যাঁ?' চমকে উঠল সুচেতনা, 'কে বলল?'

'কেউ বলেনি। গতকাল গিয়েছিলেন। আজও, তাই বললাম।'

'ও। না, মাঝে মাঝে, জায়গাটা এত ভাল!'

বাড়িতে এসে যশোমতীকে চা বানাতে বলল দিশা। সুচেতনা আপত্তি জানাল, 'আমি চা খাব না।'

'খান না?'

'খাই। আচ্ছা, অল্প একটু।'

ওরা বারান্দায় চেয়ার পেতে বসল। দিশা ব্যাগ থেকে ওষুধের কনটেনারটা বের করে সুচেতনার দিকে এগিয়ে ধরল, 'নাও।'

'একী! এটা কোথায় পেলেন?' হতভম্ব হয়ে গেল সুচেতনা।

'পেয়ে গেলাম।'

'এর তো অনেক দাম। আমি সস্তারটা ব্যবহার করি। কত দাম নিল?'

'দামের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। এই যাঃ, তুমি বলে ফেললাম।' দিশা হাসল, 'এখন থেকে তুমিও আমাকে তুমি বলবে।'

মুখটা খুলে গলায় স্প্রে করল সুচেতনা। করে বলল, 'আঃ।'

'আরাম লাগছে?'

'হ্যাঁ। যে ক'দিন বাঁচব এইটুকুই যথেষ্ট।' সুচেতনা বলল, 'কাগজে দেখছিলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওখান থেকে কয়েকজন বিজ্ঞানী নাকি অ্যাজমার ওষুধ

আমারবই.কম

বের করেছেন। ওরা দাবি করছেন ওই ওষুধ খেয়ে অনেকেই রোগমুক্ত হয়েছে। আমি শহরে খোঁজ নিয়েছিলাম, এদিকে ওই ওষুধ আসেনি। শুনলাম কলকাতার দোকানেও পাওয়া যায় না। খুব অল্প সাপ্লাই আসে। কে জানে, সত্যি সারে কি না।'

'নাম কী ওষুধটার?'

'অ্যাশমল কিংবা অ্যাশনল।'

'দেখছি আমি, পেলে তোমাকে বলব।'

'তুমি তো ম্যারেড, তোমার স্বামী এখন কোথায়?'

'কলকাতায়। ও ডাক্তার।'

'বাঃ। তা হলে ছাড়াছাড়ি কেন?'

'ডাক্তার বলে দু'জনকে একসঙ্গে থাকতে হবে?' হেসে ফেলল দিশা, 'ও সেখানে প্র্যাকটিস করে। আমার ওসব হল না বলে আমি সরকারি চাকরিতে এলাম। সরকার পাঠিয়ে দিল গ্রামে। কী করা যাবে!'

'এখানেই প্রথম?'

'না। তিনমাস ছিলাম হরিপুরে।'

'হরিপুর? প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী আপত্তি করেননি?'

'করেছিল। ইচ্ছে আমারও ছিল না। কিন্তু কী আর করা যাবে—।'

চা এল। চা খেতে খেতে ওরা দেখল দু'জন মানুষ অন্ধকারেই এগিয়ে আসছে। আলোয় আসার পর দিশা চিনতে পারল মাধবকে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার মাধব?'

'দিদি, আমার বউ!'

'ও, আচ্ছা।' ঘোমটা-টানা মহিলাকে দেখল দিশা।

'ওর শরীর খুব খারাপ, তাই—।'

'আউটডোরে নিয়ে গেলে না কেন?'

'ও যেতে চাইত না। আপনি তো আলাদা ঘরে বসেন না। যা বলার সব গৌরাঙ্গদার সামনে বলতে হবে।'

'গৌরাঙ্গবাবু কোনও ওষুধ দিয়েছেন?'

'না দিদি। উনি ব্যাটাছেলে ডাক্তার, মেয়েদের অসুখ কী করে বুঝবেন!'

হেসে ফেলল দিশা। এদের বলা বৃথা মেয়েদের রোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ

ডাক্তারদের মধ্যে খ্যাতিমানদের সংখ্যা পুরুষদের মধ্যেই বেশি।

দিশা উঠে দাঁড়াল, 'আপনি ভেতরে আসুন।'

সুচেতনা বলল, 'আমি তা হলে যাই!'

দিশা বলল, 'না না। তুমি বসো। বেশি সময় লাগবে না।'

মহিলাকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল দিশা। একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

মহিলা বসল না। দিশা বলল, 'আপনি বসুন নইলে কথা বলব কী করে?'

একটু ইতস্তত করে মহিলা বসল। দিশা উলটোদিকের চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন, আপনার কী কী অসুবিধে হচ্ছে?'

একটু নড়ে উঠল মহিলা। ঘোমটাটা আর একটু টানল। তারপর বলল, 'ব্যথা হয়।'

'কোথায়?'

জবাব এল না। সঙ্গে সঙ্গে অনুমানে বুঝে নিল দিশা, 'কখন ব্যথা হয়? শুরু হওয়ার আগে থেকেই না শুরু হওয়ার পরে?'

'আরম্ভ হলেই। খুব ব্যথা। মরে যেতে ইচ্ছে করে।'

'কদিন থাকে?'

'কখনও এক সপ্তাহ, কখনও আটদিন।'

'অন্য সময়?'

'ব্যথা থাকে না, আড়ষ্ট লাগে।'

'কত দিন আগে হয়েছে?'

'গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে।'

'এই ব্যথা কতদিন ধরে চলছে?'

'অনেকদিন।'

'দেখুন, আপনাকে, দাঁড়ান, আপনার স্বামীকে ডাকি।'

'না না।'

'কেন?'

'ওর সামনে—।'

'আপনারা স্বামী-স্ত্রী। ওর কাছে গোপন রাখা উচিত নয়।'

দিশা দরজার কাছে গিয়ে মাধবকে ডাকল, 'মাধব, তোমার স্ত্রীকে পরীক্ষা করা দরকার। কিন্তু আমার বাড়িতে তো সম্ভব নয়। তুমি কাল ওকে নিয়ে আউটডোরে এসো।'

আমারবই.কম

'আউটডোরে?'

'হ্যাঁ। আমি অন্য ঘরে ওকে পরীক্ষা করব। ভয় নেই।'

'তা হলে ঠিক আছে।' মাধব বলল, 'কোনও ভয় নেই তো দিদি?'

'না। এটা অনেক মেয়েদেরই হয়। তোমার বাচ্চা ক'টা।'

'একটাই। স্কুলে পড়ে।'

'বেশ এখন যেতে পারো।'

'কোনও ওষুধ দেবেন না?'

'না। আগে ওকে পরীক্ষা করি। তারপর।'

ওরা চলে যাওয়ার পর বারান্দায় এসে বসল দিশা। সুচেতনা জিজ্ঞাসা করল, 'ওর কী হয়েছে? বেশ ভয়ে ভয়ে এসেছিল।'

'এই ভয়ই বাঙালি মেয়েদের সর্বনাশ করল। শুধু বাঙালি মেয়ে বলছি কেন, ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মেয়ে ভয়ে নিজের অসুখ চেপে রাখে। আর তার ফলে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। দ্যাখো, এই মহিলার পিরিয়ডের প্রবলেম হচ্ছে, খুব যন্ত্রণা হয় তবু ছেলে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলেনি। লজ্জা পেয়েছে।' দিশা বলল।

'তোমার কী মনে হয়?'

'নানা কারণে হতে পারে। যদি টিউমার ফর্ম করে থাকে তা হলে অপারেশন করা ছাড়া উপায় নেই। সেটা যদি মেয়ে ডাক্তার না করে তা হলে হয়তো করাতে চাইবে না। ফিরে আসবে। অদ্ভুত।'

'তোমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে কিন্তু এখানে এটাই স্বাভাবিক।'

'কেন?'

'এখানকার বেশির ভাগ মেয়েই পুরুষদের কাছ থেকে সহানুভূতি পায় না। এরা ঘরে বউ আনে আরামের জন্যে। তাদের সেই আরাম দিতে মেয়েরা বাধ্য। ফলে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। তাই এরা স্বামীকেও নিজের অসুবিধার কথা বলে না।' সুচেতনা বলল।

দিশা অবাক হয়ে লক্ষ করছিল কথাগুলো বলার সময় সুচেতনাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। যেন মুখোশ সরিয়ে আচমকা অচেনা মুখ বের করে ফেলেছে।

'তুমি এ সব নিয়ে খুব ভাব, না?' জিজ্ঞাসা করল দিশা।

'ভেবে আর কী হবে, আমার তো কিছু করার ক্ষমতা নেই।'

'কী করলে তুমি খুশি হতে?'

'সেটাই তো ঠিক বুঝতে পারছি না। এই যে তুমি বা আমি চাকরি করতে

এতদূরে এসে একা থাকছি, বিদ্যাসাগর মশাই দূরের কথা, রবীন্দ্রনাথও ভাবতে পারতেন না। তুমি যদি ভাব এই স্বাধীনতা মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে তা হলে সেটা খুব ভুল হবে। ছেলেরা স্বাধীনতা দেয়নি। তাদের রোজগারে আর সব দিক সামলে ওঠা যাচ্ছিল না। স্রেফ অর্থনৈতিক চাপ সামলাতে মেয়েরা যখন বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইলে ওরা চোখ মুখ বন্ধ করে রইল।' সুচেতনা এক নাগাড়ে কথা বলে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল।

কথাটা মেনে নিতে পারল না দিশা। কিন্তু তর্ক করল না। এই যে সে এখানে চাকরি করতে এসেছে তা তো কোনও অর্থনৈতিক চাপ সামলাবার জন্যে নয়। নিজেকে নষ্ট না করে, তার যে আলাদা ভূমিকা আছে সেটা প্রমাণ করতেই তো এখানে আসা।

কিন্তু এই অতি শীর্ণ মেয়েটির বুকে আগুন আছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সুচেতনাকে খুব ভাল লাগছিল ওর। এখন কোথাও কোনও শব্দ নেই। সামনে অন্ধকার। হঠাৎ দুপ করে বিদ্যুৎ চলে যেতে চারপাশ ভয়ংকর কালো হয়ে গেল।

দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'না। এটা নেওয়ার পর ঠিক আছি।'

'তা হলে একটা কবিতা শোনাবে?'

'কবিতা? এখন?'

'এখনই তো সময়।'

'আমার যে পুরো মনে থাকে না।'

'যেটুকু আছে তাই—।'

'বরং আমি একটা গান গাই। আমি ঠিক গাইতে পারি না, আমাদের ওদিকের গান। বলতে পারো কোচবিহারের জীবনমুখী গান।'

'বাঃ।'

গুনগুন করে সুর ধরল সুচেতনা;

ও ভাই মোর গাও লিয়ারে
চতুর্দিকে জ্বলে সুরুষ বাতি
তোমার ঘরে আন্ধার রাতিরে
হায়রে হায়, পরের বোঝা তোমরা
কদ্দিন বইবেন ভাই।'

গান শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল সুচেতনা। তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করল,

'পরের বোঝা কদ্দিন বইবে ভাই? চলি?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। এই অন্ধকারে, তুমি একা যাবে কী করে? এই যশোমতী টর্চটা নিয়ে আয়। চলো, আমরা তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি।' দিশা বলা মাত্র আলো ফিরে এল। সুচেতনা হেসে বলল, 'তোমাকে আর বোঝা বইতে হল না।'

মাঠের মধ্যে দিয়ে একা হেঁটে চলে গেল সুচেতনা।

সকালে চা-জলখাবার খেয়ে হেলথ সেন্টারে গেল দিশা। গিয়ে দেখল জনা পাঁচেক মহিলা একটু জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাধব ছুটে এল। মহিলাদের মধ্যে তার স্ত্রীও রয়েছে। মাধব বলল, 'আপনি ওকে দেখবেন খবর পেয়ে ওরাও এসে গেছে দিদি।'

'ঠিক আছে। ওদের বলো একটু অপেক্ষা করতে।'

দিশা ডক্টর চাকলাদারের ঘরে ঢুকল। সেখানে তিনি তখন গৌরাঙ্গর সঙ্গে কথা বলছিলেন। দিশা বলল, 'গুডমর্নিং।'

'হ্যাঁ আসুন।' ডক্টর চাকলাদার বললেন, 'এই প্রথম মেয়েরা নিজের জন্যে হেলথ সেন্টারে এসেছে। এটা আপনার জন্যই সম্ভব হয়েছে। মুশকিল হল এখানে জায়গা খুব কম। আউটডোরের পেশেন্টদের দেখার জন্যে একটাই ঘর—।'

'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আমি আমার বাড়িতেও দেখতে পারি।'

'তা হলে তো—।' ভদ্রলোক ভাবলেন। 'না। দেখা উচিত এখানেই।'

গৌরাঙ্গ বলল, 'আমি না হয় বারান্দায় টেবিল নিয়ে বসছি, উনি ভেতরে বসুন।'

'তাই করবেন। সেটা অবশ্য খারাপ না—।'

দিশা হাসল, 'বেশিক্ষণ তো নয়, আমরা এই ঘরেও বসতে পারি। মেয়েদের পরীক্ষা করতে একটু আব্রু দরকার হবে, সেটা এখানেই পাওয়া যাবে।'

'তা বটে। সেটাও দরকার। ঠিক আছে, বসুন।'

'আপনি? আপনি এখন কোথায় থাকবেন?' গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করল।

'আমি সে সময়টা তোমার সঙ্গে আউটডোরে বসব।'

'আপনার কষ্ট হবে না তো স্যার!'

'আঃ। তোমরা আমাকে ক্রমশ অলস করে তুলছ। একটু জটিল কেস হলেই

আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। নিন, আপনি ঘরটাকে ঠিকঠাক করে নিন।' ডক্টর চাকলাদার উঠে দাঁড়ালেন।

মানুষটিকে ভাল লাগল দিশার। গৌরাঙ্গ বেরিয়ে গেলে সে ডক্টর চাকলাদারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার স্টেটমেন্টটার ব্যাপারে কোনও খবর পেয়েছেন?'

'না। ডক্টর রায় আজ আসতে পারেন। ওটা সি এম ও-র কাছে চলে গেছে। এ দেশের নিয়ম হল, আপনি কাজ করলেই সমালোচনার সামনে পড়বেন, লোকে দোষ ধরবে। আর কাজ না করে বসে থাকুন, সাতখুন মাপ।' ভদ্রলোক বলে গেলেন।

ঘরটি বড়। মাধব লোকজনের সাহায্যে একটা ক্যাম্পখাট এনে বিছানার ব্যবস্থা করে দিল। রেখাকে ডেকে গ্লাভস এবং সাবান জলের ব্যবস্থা হলে দিশার মনে পড়ল ছেলেটির কথা। একদম খেয়াল ছিল না।

রেখা বলল, 'আজ সকালে জ্বর নিরানব্বুইতে নেমে গেছে।'

'বেলা এগারোটা পর্যন্ত ও রকম থাকলে নিয়ে যেতে বলবে। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। কী খাবে বা করতে হবে বলে দেব।'

'আচ্ছা।'

'মেয়েরা সব নাম লিখিয়েছে?'

'এতক্ষণ লেখায়নি। আলাদা ব্যবস্থা হচ্ছে শুনলে লেখাবে।'

'বলে দাও ওদের। আর হ্যাঁ তুমি আমার পাশে থাকবে।'

মাধবের স্ত্রী প্রথমে এল। এক রাত্রেই যে তার ভয় কিছুটা কমেছে তা ঘোমটা ছোট হয়ে আসায় বোঝা গেল। চেয়ারে বসতে বলা সত্ত্বেও মহিলা বসল না। দিশা বলল, 'বলুন, আজ কেমন আছেন?'

'এখন তো কষ্ট হয় না, তখন—।'

রেখাকে ইশারা করতে সে দরজা বন্ধ করে দিল। দিয়ে মহিলাকে শুতে বলল।

মহিলা এবার ঘোমটা টানল।

দিশা বলল, 'আপনি লজ্জা পাবেন না। আমিও তো মেয়ে। আমার কাছে আপনার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আমাকে নিজের মেয়ে বলে ভাবুন।'

মহিলা ঘোমটা সরাল।

অনেক অভয় দিয়ে গ্লাভস পরা আঙুল ভেতর-শরীরে প্রবেশ করাতেই যন্ত্রণা পেলেন মহিলা। অনুমানে যা ছিল তা সত্যি বলে বুঝল দিশা। হাত ধুয়ে নিজের

চেয়ারে বসার পরেও লক্ষ করল মহিলা তখনও নিজেকে সামলাচ্ছেন। রেখা সাহায্য করতে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন।

দুটো ওষুধ লিখে দিল দিশা। তারপর রেখাকে বলল মাধবকে ডেকে আনতে। মাধব বোধহয় ধারেকাছেই ছিল, ডাক শুনে ছুটে এল।

দিশা বলল, 'তোমার খুব অন্যায় হয়েছে এতদিন ডাক্তার না দেখিয়ে।'

'ব্যথা হলেই তো গৌরাঙ্গদার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে ওকে দিতাম।'

'ব্যথা কমার ট্যাবলেট?'

'হ্যাঁ।'

'শোনো ওকে নিয়ে কালই সদর হাসপাতালে চলে যাবে। আমি সব লিখে দিচ্ছি। ওখানকার গাইনোকোলজিস্ট যা বলবেন তা করতে হবে। আর দেরি নয়।'

'কী হয়েছে দিদি?'

'তেমন মারাত্মক কিছু নয়। অনেক লোকেরই হয়। হয়তো একটা অপারেশন করতে হবে। তবে তার আগে এক্সরে তোলাতে হবে। আর হ্যাঁ, আপনি ওষুধ নিয়ে যান, আজই দু'বেলা খাওয়ার পর খাবেন। রেখা, এর পরে যে আছে তাকে ডাকো।' দিশা বলল। মাধবের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে বউকে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

জীবনে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। এই সব অশিক্ষিত অথবা আধা-শিক্ষিত মেয়েরা, যাদের বয়স পনেরো থেকে পঁচাত্তর, চিকিৎসার ব্যাপারে কী রকম অন্ধকারে পড়ে আছে। একজনের পায়ে হাজা হয়ে মারাত্মক অবস্থা হয়েছে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, কোনও ডাক্তার দেখায়নি, গ্যাঁদা পাতার রস মাখিয়ে চলেছে। একজনের অল্প অল্প জ্বর এবং কাশি হচ্ছে দীর্ঘকাল কিন্তু তাই নিয়ে সংসারের যাবতীয় কাজ করে চলেছে। কেন ডাক্তার দেখায়নি জিজ্ঞাসা করলে বলেছে, 'ব্যাটাছেলে ডাক্তার বুকে হাত দেবে বলে আসেনি। আমরা মেয়েরা হলাম গিয়ে কই মাছের মতো, সহজে মরব না।'

'তা হলে এসেছেন কেন?'

'শুনলাম মেয়েছেলে ডাক্তার আমাদের দেখবে তাই।'

'মা। আপনি এখন থেকে অসুবিধে হলেই আসবেন। যারা আপনাকে বুঝিয়েছে যে মেয়েদের হল কই মাছের প্রাণ তারা নিজেদের স্বার্থ মেটাতে মিথ্যে কথা বলেছে। আপনার যা অসুখ হয়েছে তাতে কিছু পরীক্ষা করা দরকার। যেমন বুকের ভেতরকার ছবি চাই, রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। সে সব তো এখানে হবে

না। আপনাকে সাবডিভিশনাল হাসপাতালে যেতে হবে। নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ আছে?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।

'না, নেই। ছেলে শহরে থাকে, ছেলের বাপ পারবে না।'

'তা হলে মাধব কাল ওর স্ত্রীকে নিয়ে সদরে যাচ্ছে, ওর সঙ্গে চলে যান।'

'কাল? আমি গেলে ছেলের বাপকে কে রান্না করে দেবে? সে আমাকে যেতেই দেবে না। নিজে তো রান্না করতে পারে না, খাবে কী?'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল দিশার। বেশ কড়া গলায় বলল, 'আপনি যখন পৃথিবীতে থাকবেন না তখন ওঁকে কে রেঁধে দেবে?'

'আর একটা বিয়ে করে নেবে। বুড়ো বলে তো পাত্রীর অভাব হবে না। রোজই তো এক কথা বলে, হিরের আংটি আবার বেঁকা।' মহিলার মুখ করুণ দেখায়।

আজ যারা এসেছিল সবাইকে অত্যন্ত যত্নে দেখল দিশা।

দুপুরে বাড়িতে ফিরে সে অবাক। একজন মহিলা একটি কিশোরীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যশোমতী বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছে, ওখানে যাবে না, এখানে দেখাবে।'

দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কার অসুখ?'

মহিলা বলল, 'এর।'

'হেলথ সেন্টারে যাননি কেন?'

মহিলা মুখ নিচু করল। দিশা কিশোরীর দিকে তাকাতে সে বলল, 'সবাই জেনে যাবে, জেনে গেলে আমার বিয়ে হবে না, তাই।'

'কেউ কিছু জানবে না। আমি মহিলাদের আলাদা ঘরে দেখি।'

কিশোরী বলল, 'ওখানে তো রেখাদিদি থাকে। ও বলে দেবে।'

মাথা নাড়ল দিশা। কী অন্ধ ধারণা। রেখা বলে দেবে এই অনুমানে তাকেও এরা বিশ্বাস করছে না। সে বলল, 'ভেতরে আসুন। আজ আমি আপনাদের এখানে দেখছি কিন্তু ইমার্জেন্সি ছাড়া কাউকে এখানে দেখব না। যদি রেখা কাউকে রোগের কথা বলে তা হলে ওর চাকরি চলে যাবে। ও কাউকে বলবে না।'

ভেতরে আসার পর মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল দিশা। 'কী হয়েছে?'

'ওর বুকে একটা ফোড়া হয়েছে।'

'ফোড়া?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কোনও মুখ নেই।'

'কতদিন হয়েছে?

'তা তিনমাস হয়ে গেল।'

'কাউকে তো দেখাননি!'

'কী বলছেন, আইবুড়ো মেয়ের বুক ব্যাটাছেলে ডাক্তারকে দেখানো যায়?'

কিশোরীকে ডাকল দিশা, 'এদিকে এসো। বুকটা খোলো, দেখতে হবে।'

'না।' বেঁকে দাঁড়াল মেয়েটা।

'তোমার ফোড়া না দেখলে আমি ওষুধ দেব কী করে?'

'আমার লজ্জা করছে।'

'ডাক্তারের কাছে লজ্জা করার কোনও মানে হয় না। খোলো।'

অনেক কথার পর চোখ বন্ধ করে কিশোরী তার বুক দেখাল। আঙুল দিয়েই বুঝতে পারল দিশা। এটা একটি সিস্ট হতে পারে আবার ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এক্সরে করে অপারেশনের পর বায়োপসি করলে তবেই এর সঠিক ভূমিকা জানা যাবে। নিরীহ হলে অপারেশনের দাগ ছাড়া কোনও ক্ষতি হবে না বুকের। কিন্তু অন্যটা হলে বুক বাদ দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।

হঠাৎ নিজেকে খুব অসহায় বলে মনে হল। এইসব অসুখের চিকিৎসা তার হাতের বাইরে। যাকেই সে বলছে সদরে যেতে হবে তার মুখে অন্ধকার নেমে আসতে দেখছে সে। একই কথা বলল সে মেয়েটির মাকে।

মহিলা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। দিশা তাকে অভয় দিল। সব রকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। শেষ পর্যন্ত বলল হেলথ সেন্টার থেকে যদি ছুটি পায় তা হলে সে নিজে ওদের সঙ্গে যাবে। এতে মহিলা কেঁদে ফেলে ওর হাত জড়িয়ে ধরল।

কলকাতা শহরে যা জলের মতো সহজ তা এখানে কি ভয়ংকর কঠিন। টাকা থাকলে কলকাতায় যে কোনও অপারেশন তিনদিনে করা সম্ভব। টাকা না থাকলে হাসপাতাল বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধরনা দিলে শেষপর্যন্ত সুরাহা হয়ে যায়। অথচ এখানে এদের কাছে অকল্পনীয় ব্যাপার। কোনও জটিল কেস পেলে সূর্য কলকাতায় বসে সেই রোগের বিশেষজ্ঞদের নাম নিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে পারে। সে এখানে সেটা পারে না। বড় জোর বলতে পারে সদর হাসপাতালে যান। যে যেতে পারছে না তাকে সুস্থ করার কোনও উপায় তার

নেই। আবার যে যাচ্ছে সে যে সদর হাসপাতালে ঠিকঠাক চিকিৎসার সুযোগ পাবে তারও স্থিরতা নেই। গৌরাঙ্গ বলছিল এখন সাবডিভিশন্যালের মতো সদর হাসপাতালেও আলট্রাসাউন্ড অথবা ইকোকার্ডিওগ্রাফি হয় না। অথচ গলব্লাডার বা কিডনিতে স্টোন আছে কিনা জানতে আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা করা অবশ্যই কর্তব্য। এটা না করে ওখানে অপারেশন নিশ্চয়ই ডাক্তাররা করেন না। তা হলে পেশেন্টকে যেতে হবে কলকাতায়। যার সামর্থ্য নেই সে যাবে না, যার আছে সে সেখানে গিয়ে দিশেহারা হবে।

কিন্তু দিশা যতই বিষণ্ণ হোক, পরদিন হেলথ সেন্টারে গিয়ে চমকে উঠল। তাকে ডেকে পাঠালেন ডক্টর চাকলাদার, 'কী করেছেন আপনি?'

'আমি? আমি তো কিছুই করিনি।'

'করেছেন। এই যে গতকাল খুব সহানুভূতির সঙ্গে মেয়েদের আলাদা পরীক্ষা করেছেন, তাদের অসুখের কথা শুনেছেন, সেটাই মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছে। ফলে দলে দলে মহিলারা এসে উপস্থিত হয়েছে। এখন ঠ্যালা সামলান।' ডক্টর চাকলাদার উদ্বিগ্ন মুখে বললেন।

'হ্যাঁ। দেখছি তাই।'

'আপনার পক্ষে এত পেশেন্ট একদিনে দেখা সম্ভব নয়।' ডক্টর চাকলাদার খুব বিরক্ত।

গৌরাঙ্গ ঘরে ঢুকল, 'স্যার, পার হেড যদি ছয় মিনিট করে ধরি তা হলে ঘণ্টায় দশজন। তার মানে চল্লিশজনের বেশি ম্যাডাম দেখতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে প্রথম চল্লিশ জনকে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। বাকিদের বলি কালকে আসতে।'

'ক'জন এসেছে?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।

'ছেষট্টি, এই তো গুনলাম।'

'কিন্তু যারা ফিরে যাবে তাদের কারও যদি ইমার্জেন্সি থাকে?' দিশা প্রশ্ন করল।

'দূর। এত বছর ধরে কেউ এদিকে পা দেয়নি আর আজই ইমার্জেন্সি হয়ে যাবে? এরা ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়। কিন্তু ম্যাডাম, চব্বিশজনও কি বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

'আমি জানি না। যতটা পারব ততটাই দেখব।'

'আপনি তো দেখবেন কিন্তু নার্সরা থাকতে রাজি হবে কিনা জানি না।'

'আগে ওরা আপত্তি জানাক তখন ভাবা যাবে।'

ডক্টর চাকলাদার বললেন, 'এই ঘরটাকে তা হলে ছেড়ে দিতে হবে?'

গৌরাঙ্গ বলল, 'তা কি হয়? ম্যাডাম যদি ওপাশের ঘরটা ব্যবহার করেন, যার একটা দিকে আলমারি আছে, ওখানেই বসতে পারেন। আমি চটপট মাধবকে বলে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ম্যাডাম একবার ঘরটা দেখবেন আসুন।'

ঘর দেখল দিশা। কোনওমতে একটা টেবিল দুটো চেয়ার পেতে যে জায়গা থাকছে তাতে দুটো লম্বা বেঞ্চির ওপর তোশক ফেলে বিছানা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। ব্যবস্থাটা মেনে নিল দিশা। হেড অফ দ্য অরগানাইজেশনের অফিসকে রোজ দখল করে রাখা ঠিক নয়। আজ রেখা নয়, সরলা নামের একটি মেয়ে নার্স হিসেবে এসেছে। মেয়েটি বলল, 'দিদি, এই ঘরে আপনার কষ্ট হবে না?'

'হবে। কিন্তু বাইরে যারা অপেক্ষা করছে তাদের কষ্টের কাছে সেটা কিছু নয়।' দিশার কথা শুনে মেয়েটির মুখের চেহারাই বদলে গেল।

প্রথম ঘণ্টায় মাত্র ছয়জন পেশেন্টকে দেখতে পারল দিশা। এভাবে চললে বিকেল তিনটে বেজে যাবে! কিন্তু কিছু করার নেই। দুপুর বারোটার পর ডক্টর চাকলাদার ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'নিয়মটা ভাঙলেন? আপনার পরিশ্রম হচ্ছে কিন্তু—।'

'আউটডোর কি এর পরে বন্ধ হয়ে যায়?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু যাদের নাম্বার দেওয়া হয়েছে তাদের কী করে বলব চলে যেতে?'

'দেখুন। যা ভাল মনে করেন করুন।' ডক্টর চাকলাদার বললেন।

বিকেল তিনটের সময় দেখা গেল দু'জন পেশেন্ট বসে আছে। ওরা সেই সকাল থেকে অপেক্ষা করছে। খাওয়াদাওয়া নেই। তাদের একজনকে ডেকে অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করতে মহিলা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন। দিশার মনে হল সরলা দাঁড়িয়ে থাকায় কথা বলতে চাইছে না মহিলা। সরলাকে বাইরে যেতে বলে আবার জিজ্ঞাসা করতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মহিলা। দিশা ভাল করে লক্ষ করল। মহিলা বিবাহিতা নয়। এখানে সিঁদুর এবং শাঁখার ব্যবহার বেশ প্রবল। ওর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু কুমারী বলেও মনে হচ্ছে। সম্ভবত বিধবা।

'আপনি আমাকে খুলে বলুন। আপনি কি বিবাহিতা?'

'বিয়ে হয়েছিল। স্বামী নিরুদ্দেশে।'

'ও! তা হলে সিঁদুর, শাঁখা—।'

'বারো বছর পরে বাপের বাড়ির লোকজন খুলে দিয়েছিল। বলেছিল বিধবা হয়েছি।'

'তিনি মারা গিয়েছেন কিনা নিশ্চিত না হয়েও বিধবা হয়েছেন?'

'সবাই জোর করেছিল।'

'ছেলেমেয়ে?'

'ছিল না।'

'তা হলে এখন সমস্যা কী?'

'তিনমাস আগে দেওর এসেছিল। সম্পত্তি ভাগাভাগি হবে। আমি যতই বিধবা ভাবি আইনের চোখে আমার নাকি সম্পত্তি পাওয়ার কথা। শুনে ভাইরা জোর করে পাঠিয়ে দিল। দেওর আমাকে উকিলের বাড়িতে যাওয়ার নাম করে শহরে নিয়ে গেল।'

'আপনার সঙ্গে আর কেউ যায়নি?'

'না।'

'তারপর?'

'সেখানে গিয়ে হোটেলে উঠল। উঠে আমার সর্বনাশ করল।'

'সে কী?'

আবার কাঁদল মহিলা। 'আমি ওর পায়ে পড়েছিলাম, বলল রাজি না হলে সম্পত্তির ভাগ দেবে না। তবু রাজি হইনি। শেষে কী সব খাইয়ে দিয়ে—!' মহিলা নিশ্বাস নিল, 'পরের দিন পৌঁছে দিয়ে গেল এখানে।'

'সম্পত্তি?'

'তার কথা আর কিছুই বলল না।'

'তারপর?'

'পরের মাস থেকে সব বন্ধ হয়ে গেছে আমার! আমি এখন কী করব? লোকে জানলে, দাদারা জানলে মেরে ফেলবে আমাকে। আমি বিলের জলে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে জঙ্গল থেকে হঠাৎ তিনটে ছেলে বেরিয়ে এল বন্দুক হাতে। তাদের আমি চিনি না। আমার কথা সব জেনে নিল তারা। তারপর বলল আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। দিদি, বড় আশা নিয়ে এসেছি, আমাকে বাঁচান।'

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল দিশা। তারপর হুঁশ ফিরতেই জিজ্ঞাসা করল, 'ওই বন্দুকধারী ছেলেরা আপনাকে আমার কথা বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ক'মাস বন্ধ আছে?'

'দু'মাস।' দু'হাতে মুখ ঢাকল মহিলা।

এখন সে কী করবে? চিকিৎসা শাস্ত্র বলছে প্রথমেই ওর ইউরিন পরীক্ষা করানো

দরকার। যদিও নব্বুইভাগ কারণ আছে মহিলার গর্ভবতী হওয়ার, দশভাগ অন্য কারণের জন্যে পিরিয়ড বন্ধ হয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। ইউরিন পরীক্ষা করালে সেটা জানা যেত। কিন্তু করাতে হলে ওকে যেতে হবে সাব-ডিভিশন্যাল শহরে। কী বলে যাবে মহিলা? কে নিয়ে যাবে? আর যদি গর্ভবতী হয়েই থাকে তা হলে ওকে মুক্ত করতে কোনও অসুবিধে নেই। বেশি দেরি তো হয়নি। সে মহিলাকে আশ্বাস দিল, 'আপনি একটুও ভাববেন না। আমার কাছে যখন এসে গিয়েছেন তখন এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মন ভাল রাখুন।'

'আমাকে কি ওষুধ দেবেন?'

'না। আপনি কাল বিকেলে আমার বাড়িতে আসতে পারবেন?'

'হ্যাঁ।'

'এই যে এসেছেন, বাড়িতে কী বলে এসেছেন?'

'ওই সময় খুব ব্যথা হয় বলে এসেছি। এটা মিথ্যে কথা।'

'ঠিক আছে। আসুন।'

শেষ পেশেন্টকে বিদায় করে দিশা সরলাকে বলল, 'তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম।'

'না দিদি। আপনি যে আজ কত মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছেন জানেন না। আমার খুব গর্ব হচ্ছিল কাজ করতে।' সরলা বলল।

ডক্টর চাকলাদারের ঘরের দিকে এগোতেই গাড়িটা দেখতে পেল। কার গাড়ি? মাধব ছুটে এল, 'দিদি, বড় ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

'বড় ডাক্তারবাবু?'

'হ্যাঁ। আপনার খোঁজ করছিলেন। আপনি রোগী দেখছেন শুনে ডাকতে নিষেধ করলেন।'

'উনি কোথায় এখন?'

'সাহেবের ঘরে।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে পারি?'

ডক্টর চৌধুরী তাকালেন, 'আসুন। কনগ্রাচুলেশনস।'

'কেন?'

'শুনলাম আপনি এখানে বিপ্লব করেছেন? যে মহিলারা কোনওদিন হেলথ সেন্টারে আসত না তারা নাকি আপনার কাছে আসছে। পরিবারের মেরুদণ্ড হল মহিলারা। এতকাল তাদের তো চিকিৎসাই হত না। এখন থেকে আপনার জন্যে হবে।'

'কিন্তু আমার অবস্থা তো নিধিরাম সর্দারের মতো।'

'যেমন?'

'আজ অন্তত বাইশজন পেশেন্ট পেয়েছি যাদের রক্ত এখনই পরীক্ষা করানো দরকার। সাতজনের এক্সরে করা প্রয়োজন। কয়েকজনের ইউরিন। যদি এই ব্যবস্থা এখানেই করা যেত তা হলে এরা বেঁচে যেত। এদের যা অর্থনৈতিক এবং পারিবারিক অবস্থা তাতে ওয়ান ফোর্থও শহরে যাবে না পরীক্ষা করাতে। অনেকগুলো বাচ্চা হয়ে যাওয়া কোনও মা যদি এবার অ্যাবরশন করাতে চায় তা হলে আমি তা পারব না।'

ডক্টর চাকলাদার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন আর্লি স্টেজে?'

'আর্লি স্টেজেও ব্লিডিং হতে পারে। ওর শরীরের সিস্টেম পরীক্ষা না করে অ্যাবরশন করাটা তো জুয়ো খেলা হয়ে যাবে।' দিশা বলল।

ডক্টর রায় বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন। হেলথ সেন্টার খোলা হয়েছিল কারণ যেখানে কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই সেখানে অন্তত মিনিমাম চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। কয়েকটা ছোটখাটো টেস্ট যাতে এখানে করা যায় তার জন্যে চেষ্টা করব।'

'আপনি যদি একটা ইসিজি মেশিন আর মিনিমাম অপারেশনের ব্যবস্থা করে দেন তা হলে খুব ভাল হয়।' দিশা বলল।

'মনে থাকবে।' ডক্টর রায় বললেন, 'আপনি সেই সকাল থেকে আউটডোরে আছেন। স্নান খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই। যান, সেরে ফেলুন। আমি অপেক্ষা করছি।'

'আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন স্যার?'

'হ্যাঁ। এস পি আমাকে ফোন করেছিলেন, বুলেট বের করার কেসটা ওঁরা এড়িয়ে যেতে পারছেন না। আপনি স্বামী সংসার ছেড়ে এখানে একা কেন চাকরি করতে এসেছেন এটাও ওঁদের প্রশ্ন। স্রেফ মানবিকতার কারণে আপনি ছেলেটির চিকিৎসা করেছেন এটা বিশ্বাস না করতে দারোগা ওকে সাহায্য করেছেন। আমি ওদের বলেছি তদন্ত করতে। ততদিন যেন আপনাকে বিরক্ত না করা হয়। আমাকে কথা দিতে হয়েছে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি এখানেই থাকবেন।' ডক্টর রায় কথাগুলো বলে মুখ নামালেন।

'কিন্তু স্যার—'

'আমি জানি। তবে মনে রাখবেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এদিকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন এবং রিপোর্ট আমি ডি এম ও-কে পাঠিয়েছি। তিনি কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে কলকাতায় ফরোয়ার্ড করেছেন। সেক্রেটারি কী সিদ্ধান্ত নেন তার ওপর সব নির্ভর করছে। তবে আমি আজ কলকাতায় যাচ্ছি। ওঁদের সঙ্গে কথা বলব।' ডক্টর রায় বললেন।

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

'আপনার স্বামীকে কিছু বলার থাকলে, যা আমাকে বলা যায়, বলতে পারেন। টেলিফোন নাম্বার দিলে জানিয়ে দিতে পারি।'

একটা কাগজে নাম্বার লিখে ডক্টর রায়কে দিল দিশা। বলল, 'তেমন কিছু নয়, শুধু বলবেন যে এবার আমি যেতে পারছি না, ও যেন সুবিধে মতো আসে।'

'ওকে!' ডক্টর রায় হাসলেন, 'চিয়ার আপ! পুলিশ বা সরকার কী বলল তাতে কিছু এসে যায় না, আপনার বিবেক পরিষ্কার থাকলে কোনও বাধাই বাধা নয়। যান, স্নান খাওয়া করে নিন।'

এই অবেলায় স্নান করেও খেতে ইচ্ছে করছিল না দিশার। কিন্তু সে যখন জানতে পারল যশোমতীও না খেয়ে বসে আছে তখন ওকে মৃদু বকল। বকে খেতে বসল। খাওয়ার পর সে চুপচাপ শুয়েছিল। এই যে আজ চল্লিশটা মহিলার কথা সে শুনল এগুলো এরা এর আগে কাউকেই বলেনি। ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে এই রকম কোটি কোটি মহিলা আছেন যাদের কথা কলকাতায় বসে সে জানত না এমন করে। মাঝে মাঝে এদের চিকিৎসার ব্যাপারে সে যত অসুবিধাই বোধ করুক কিন্তু এখন কীরকম আনন্দ হচ্ছে। এরা তাকে বিশ্বাস করেছে। তার ওপর ভরসা করছে। কলকাতার নার্সিং হোমের চাকরি তাকে এতটা সম্মান কখনই দিতে পারে না।

অন্যান্যদের অসুখ আছে, ওষুধ চললে কোনও জটিলতা হবে না। শুধু দু'জন। ওই যে মেয়েটি যার বুকে সিস্ট হয়েছে আর যাকে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এদের এখনই সাহায্য করা দরকার। আচ্ছা, যে লোকটা, মহিলার দেওর, ওকে কোনও শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নেই? না নেই। দিতে হলে পুলিশকে জানাতে হবে, জানালে এই মহিলার পক্ষে আর গ্রামে থাকা সম্ভব হবে না। অপরাধ করেও পুরুষেরা তাই বেঁচে যায় বারংবার। নিশ্বাস ফেলল দিশা।

ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল সে। যাওয়া হচ্ছে না। হঠাৎ মন খুব খারাপ হয়ে গেল। সূর্যর সঙ্গে কি এভাবেই তার দূরত্ব বেড়ে যাবে। মাইনে পেয়ে সে সূর্যকে টাকা দিতে গিয়েছিল। সূর্য বলেছিল, মাকে দাও। শাশুড়ি মা বলেছিলেন, 'পাগল। তোমার টাকা ব্যাঙ্কে জমাও। আমাদের লাগলে নিশ্চয়ই চাইব।' অর্থাৎ তোমার টাকা আমরা এখন নেব না। দিতে পারলে বেশি ভাল লাগত, নিজেকে সংসারের একজন বলে মনে হত, এটা ওরা বুঝলেন না।

যশোমতী এল, 'একদম ভুলে গেছি।'

'কী?'

'তোমার একটা চিঠি এসেছে।' পেছন থেকে হাত সামনে এনে চিঠি দিল।

'কখন এসেছে?'

'দুপুরবেলায়।'

চিঠিটা খুলে খুব ভাল লাগল দিশার। শাশুড়িমায়ের চিঠি। লিখেছেন, 'তোর বরের কাছে শুনলাম খুব সুন্দর একটা বাড়িতে তুই আছিস। শুনে খুব লোভ হচ্ছে। আমি যে কোনওদিন বাসে উঠে বসতে পারি। অবশ্য তোর আসার আগে নয়। ভাল থাকিস। আমরা সবাই ভাল। আশীর্বাদিকা তোর শাশুড়িমা।'

উনি এলে খুব ভাল হয়। যশোমতী জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল খবর?'

'হ্যাঁ। আমার শাশুড়ির চিঠি।'

'শাশুড়ি? ওরে বাবা।'

'এখানে আসতে পারে।'

'বিধবা না সধবা?'

'কেন?'

'সধবা শাশুড়িরা খুব রাগী হয়।'

হেসে ফেলল দিশা, 'আর বিধবারা?'

'কম। ওদের মনে দুঃখ থাকে তো!'

'একেবারে পাকা বুড়ি হয়ে গেছিস। নে, চল, একটু ঘুরে আসি।'

দরজায় তালা দিয়ে ওরা বের হল। মাঠ পার হওয়ার সময় দিশা দেখল হেলথ সেন্টারের সামনে ডক্টর রায়ের গাড়িটা নেই। ওরা হাঁটতে হাঁটতে দোকানদারের কাছে চলে এল। দিশা বলল, 'সুচেতনাকে কি বেরুতে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। বেশ কিছুক্ষণ আগে ঝিলের দিকে গেছেন।' দোকানদার বলল।

'ও। ঝিল ওকে বোধহয় টানে।'

'জায়গাটা ভাল নয়। আজেবাজে লোক ওখানে ঘুরছে শুনতে পাই।'

'আজে বাজে লোক মানে?'

'অ্যান্টি সোশ্যাল।'

'তাই নাকি?'

দিশার মনে পড়ে গেল। যে মহিলা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল তাকে কিছু ছেলে, যাদের হাতে বন্দুক ছিল, বাঁচিয়েছে। উপদেশ দিয়েছে দিশার কাছে সাহায্যের জন্যে যেতে। এই ছেলেগুলো কারা? উগ্রপন্থী? এদের কাউকে কি সে অপারেট করেছিল?

দোকানদার বলল, 'দিদি, একটা অনুরোধ করব?'

'বলুন।'

'আমি একটা দোতলা বাড়ি বানিয়েছি। দোতলায় নিজেরা থাকি, একতলা ভাড়া দেব ভাবছি। একবার যদি পায়ের ধুলো দেন।'

'এভাবে বলছেন কেন? নিশ্চয়ই যাব। এখন যাওয়া যাবে?'

লোকটি যেন হাতে স্বর্গ পেল। সহকারীর ওপরে দোকানের দায়িত্ব দিয়ে সে পথ দেখিয়ে চলল। দোকান থেকে বাড়ি পাঁচ মিনিটের পথ। মফস্সলের বাড়ি যেমন হয়। তবে একতলার ব্যবস্থা সবই আলাদা। দোতলায় উঠতে হল। একটি বাচ্চা ছেলেকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী নাম তোমার?'

'তপন।'

'বাঃ। তোমার মা কোথায়?'

'মায়ের জ্বর।'

'আপনার স্ত্রীর অসুখ বলেননি তো?'

'হ্যাঁ। ক'দিন থেকেই—।'

'হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাননি কেন'?

'আগে তো কোনও মেয়েছেলে যেত না, আপনি আসার পরে—। আজ গিয়েছিলাম কিন্তু শুনলাম চল্লিশজনের বেশি দেখা হবে না। আর ও তিন-চার ঘন্টা বসে থাকতেও পারত না।'

'কী ওষুধ খাওয়াচ্ছেন?'

'গৌরাঙ্গদাই দিয়েছেন, ক্রোসিন।'

দিশা ভেতরে ঢুকল। কম্বলে মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন মহিলা। তারপর যশোমতীকে চাবিটা দিয়ে ফিসফিস করে নির্দেশ দিল। মেয়েটা ছুটে বেরিয়ে গেলে সে জিজ্ঞাসা করল 'জ্বর দেখেছ?'

'হ্যাঁ। দুপুরে দুই ছিল।'

'ঠিক ক'দিন আগে জ্বর এসেছিল?'

এবার মহিলা কাঁপা গলায় বলল, 'অল্প অল্প জ্বর মাঝেমাঝেই হয়। পরশু থেকে হঠাৎ বেড়ে গেছে।'

রাগ হয়ে গেল দিশার, 'আপনার তো টাকা পয়সা আছে। ওকে নিয়ে শহরে চলে গেলেন না কেন? শুধু দোকান নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে?'

'বলো, ওকে বলো।' মহিলা জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিল।

যশোমতী স্টেথো নিয়ে এলে দিশা বলল, 'মা, এবার ওপাশ ফিরে শোন। হ্যাঁ।

এবার জোরে জোরে নিশ্বাস নিন। বাঃ।'

পরীক্ষার পর দিশা নিশ্চিত হল এর ফুসফুসে জল জমেছে। সে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। আপনি কালই শহরে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করাবেন বুকে, রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। আমি সব লিখে দিচ্ছি।'

মহিলা বলল, 'মা। আমি হাসপাতালে যাব না। কিছুতেই না।'

'আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে না।'

'তা হলে?'

'ওগুলো পরীক্ষা করিয়ে চলে আসবেন। আমি কাল ওখানে যাব। রিপোর্ট আমাকে ওখানেই দেখালে আমি ওষুধ লিখে দেব। সেগুলো কিনে নিয়ে এলে এই বাড়িতেই চিকিৎসা করাব, কয়েকদিনের মধ্যে ভাল হয়ে যাবেন।'

'ভগবান, আপনার কথা যেন সত্যি হয়।'

বেরুবার সময় ভদ্রলোক নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'দক্ষিণা কত দেব?'

'সরকার আমাকে মাইনে দিচ্ছেন আপনাদের দেখার জন্যে। তাই না?'

সন্ধে নেমে গিয়েছিল। দোকানের সামনে আসতেই দূর থেকে গলা ভেসে এল, 'দিশা?' দিশা মুখ ফিরিয়ে দেখল সুচেতনা হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে।

দিশা শাসন করল, 'তোমার খোঁজে আমি এলাম আর তুমি ঝিলের ধারে গেছো। সন্ধের পরে ওখানে যাওয়া ঠিক নয় তুমি জানো না!'

হাসল সুচেতনা। 'আমাকে যমেও ছোঁবে না। চলো, চা খাওয়াবে।'

'আজ হঠাৎ ইচ্ছে হচ্ছে?'

'হল। হয়ে গেল।' সুচেতনা আবার হাসল।

যশোমতী চা করছিল। বারান্দায় বসে দিশা সুচেতনাকে আজকের অভিজ্ঞতার কথা বলছিল। মেয়েরা এখানে এত অসহায় সে এমন করে আগে জানেনি। হঠাৎ ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'সুচেতনা তুমি পরশু ছুটি নিতে পারবে?'

'পরশু এবং তরশু আমার ছুটি। কেন?'

'একটি বিধবা মেয়েকে নিয়ে শহরে যেতে হবে। ওকে অ্যাবরশন করিয়ে আনতে হবে।'

'সেকী? কেন?'

ঘটনাটা খুলে বলল দিশা।

শোনার পর গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর সুচেতনা বলল, 'ওর দেবর

লোকটার শাস্তি কেন হবে না বলতে পার?'

'হবে না। কারণ এদেশের পুরুষরা এভাবেই বেঁচে যায়।'

'লোকটার নাম কী? থাকে কোথায়?'

'জিজ্ঞাসা করিনি। করে কী লাভ?'

'লাভ আছে। মেয়েটা যদি নাম ধাম বলে তা হলে তুমি যা করতে বলছ তাই করব। ওর না বলা মানে লোকটাকে সাহায্য করা।' সুচেতনা উত্তেজিত।

'ঠিক আছে, ধরো ও বলল। তুমি কী করবে? পুলিশে যাবে? গেলে এই মেয়েটা আর কখনও গ্রামে ফিরতে পারবে? মনে রেখো ওর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, বিধবা। ক্ষতি তো ওরই হয়ে যাবে।'

'বেশ। আমি যাব লোকটার কাছে। ক্ষতিপূরণ চাইব।'

'ছেলেমানুষি কোরো না।'

'ছেলেমানুষি নয়। আমি ওর সর্বনাশ করে দিতে পারি।'

'ঠিক আছে বাবা। আর উত্তেজিত হয়ো না, তোমারই শরীর খারাপ হবে।'

চা দিয়ে গেল যশোমতী। চা খেতে খেতে দিশা বলল, 'আমরা মেয়ে বলছি, আসলে মহিলা। এই মহিলা ঝিলের জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। ওকে বাঁচায় কয়েকজন ছেলে।'

শোনামাত্র মুখ ফিরিয়ে তাকাল সুচেতনা। দিশা বলল, 'ওদের হাতে বন্দুক ছিল। ওরা ওকে বাধ্য করে কেন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল তার কারণ বলতে। ও বলতে বাধ্য হয়। শোনার পর ছেলেগুলো নাকি আমার কাছে আসতে বলেছিল। আমি ভেবেই পাচ্ছি না ওরা কে? আমাকে কী করে চিনল? বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে পুলিশ যাদের উগ্রপন্থী বলছে এরা তারাই।'

সুচেতনা জিজ্ঞাসা করল, 'ওই ছেলেদের কথা মহিলা ক'জনকে বলেছে।'

'মনে হয় কাউকে বলেনি। বললে যে নিজের কথা বলতে হয়।'

সুচেতনা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'উগ্রপন্থী মানে কী?'

'যারা চরমপন্থায় বিশ্বাস করে। জঙ্গি।'

'ধরো ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষ দখল করে ছিল তখন কেউ যদি লন্ডনে রানির বাড়িতে বোমা ছোড়ে তা হলে তাকে কী বলা হবে?'

'অবশ্যই উগ্রপন্থী।'

'দেশের মানুষও তাই বলবে?'

'না। দেশের মানুষের কাছে সে স্বাধীনতা সৈনিক, বিপ্লবী।'

'ঠিক তাই। আচ্ছা, আমি উঠি। পরশু সকালে মহিলাকে এখানে আসতে বলবে। নিয়ে যাব।' যশোমতী তৈরি ছিল, টর্চ জেলে পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

সুচেতনা চলে গেলে চায়ের কাপের দিকে চোখ পড়ল দিশার, এক চুমুকও খায়নি মেয়েটা।

আজ সাতসকালে স্নান করে নিয়েছিল দিশা। যশোমতীকে বলেছিল তুই দুপুরে ভাত করে নিস, আমাকে সকালে রুটি তরকারি দিস। মেয়েটা বেশ চটপটে হয়ে উঠেছে। তাকে খাবার দিয়ে ও বাইরে গিয়েছিল, ফিরে এসে বলল, 'ও দিদি, তোমাদের ওখানে যে মেলা বসে গেছে।'

'মেলা! মানে?'

'কত মেয়েছেলে এসে লাইন দিয়েছে। গুনতে পারলাম না।' মেয়েটা চোখ বড় করল।

হঠাৎ সূর্যর মুখ মনে পড়ল তার। আজ ভোরের একটু আগে সে সূর্যকে স্বপ্ন দেখেছিল। সূর্য এসেছিল ঝিলের ধারে। এসে বলেছিল, 'তুমি আর আমাকে বোধহয় ভালবাসো না দিশা।' শুনে বুক মুচড়ে উঠেছিল। কিন্তু যতবার সে কথা বলতে যাচ্ছিল ততবারই কোথাও গুলির শব্দ হচ্ছিল। নিজের কথা নিজেই বুঝতে পারছিল না।

ঘুম ভেঙে যেতে খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সূর্যকে সে যে ভালবাসে তা কি বলার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এটাও তো ঠিক, এখানে আসার পর সূর্যর জন্যে যে কষ্ট হত তা এখন অনেকটাই নেই। অন্তত এই মহিলারা এসে তার সময় কেড়ে নেওয়ার পর থেকেই অন্য এক স্রোতের টানে সে ভেসে চলেছে।

হেলথ সেন্টারের সামনে এসে চক্ষু চড়ক গাছ। প্রায় শ আড়াই মহিলা শিশুসহ দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখামাত্র সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল। দিদি শব্দটা বারংবার কানে আসতে লাগল। একজন বয়স্কা এগিয়ে এল, 'দিদি, আমি কখনও ডাক্তার দেখাইনি। আমার শরীরে খুব কষ্ট। মেয়েছেলে ডাক্তার কখনও এখানে আসেনি। আপনি আমাকে সারিয়ে দিন।'

সে বারান্দায় উঠে আসতেই ডক্টর চাকলাদার, গৌরাঙ্গ এবং মাধব বেরিয়ে এল। সেন্টারের যাবতীয় নার্স ভয়ার্ত চোখে দাঁড়িয়ে এদের দেখছে।

ডক্টর চাকলাদার বললেন, 'কী করা যায়? থানায় খবর দেব?'

গৌরাঙ্গ বলল, 'ম্যাডাম কী বলেন দেখুন।'

দিশা বলল, 'যতক্ষণ এরা শান্ত থাকছেন ততক্ষণ থানায় খবর দেওয়ার কী দরকার? দারোগা তো চিকিৎসা করবে না।'

ডক্টর চাকলাদার বললেন, 'তা হলে বলে দেওয়া হোক, এখানে দেখাতে হলে

আমারবই.কম

পুরুষ-নারী ডাক্তার বিচার করা চলবে না। যে গৌরাঙ্গ বা আমাকে চাইবে না সে যেন চলে যায়, এখানে ভিড় না করে।'

'আপনি জানেন এই কথা শুনলে ভিড় ফাঁকা হয়ে যাবে।'

'আমি তো তাই চাই। এত লোককে আপনি দেখতে পারবেন? রোজ চল্লিশজন পেশেন্টকে দেখলেও ঠিকঠাক চিকিৎসা হয় না।'

'একদম না হওয়ার থেকে তো সেটা বরং ভাল।'

'তা হলে আপনি কী করতে চাইছেন?'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি ঘরে গিয়ে বসুন, আমি এদের সঙ্গে একটু কথা বলে ঠিক করে নিই কী করব।' দিশা বলল।

কথাটা মনঃপূত হল ডক্টর চাকলাদারের। 'থ্যাঙ্ক ইউ! আমি টেনশন একদম নিতে পারি না। দেখুন।' ভদ্রলোক নিজের ঘরে চলে গেলেন।

মহিলারা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বারান্দার ধারে এসে যতটা সম্ভব ওপরে গলা তুলে দিশা বলল, 'মা ও বোনেরা, আপনারা আমার কথা শুনুন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে সময় দেব। সবার অসুখের কথা শুনে ওষুধ দেব। কিন্তু একদিনে আমার একার পক্ষে কতজনকে দেখা সম্ভব? আপনারা রান্না করেন। আট-দশটা পদ নিশ্চয়ই রান্না করে দিতে পারবেন দুপুরের খাওয়ার আগে। কিন্তু যদি বলা হয় দু'শোটা পদ কয়েক ঘণ্টায় রান্না করে দিন তা হলে কি সেটা পারবেন? সম্ভব? বলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের মাথা দু'পাশে ঘুরল। না। দিশা বলল, 'আমারও সেই অবস্থা। গতকাল আমি চল্লিশজনকে দেখেছিলাম। আজ পঞ্চাশজনকে দেখব। আর পুরনো যারা ওষুধ খাওয়ার পর এসেছেন, তাদের যদি সমস্যা থাকে তা হলে এখন চলে যান, বিকেল চারটের সময় আসবেন। তখন আপনাদের কথা শুনব।'

সঙ্গে সঙ্গে মাধব নেমে গেল নীচে, 'কী? দিদি ঠিক বলেছে কিনা? অ্যাঁ? এত মানুষকে দেখা সম্ভব? এটা কি লঙ্গরখানার খিচুড়ি দেওয়া? প্রথম পঞ্চাশজন দাঁড়িয়ে যান। আবার কাল আসবেন বাকিরা। এত দেখতে হলে দিদিরই অসুখ হয়ে যাবে!'

পুরুষরাও এসেছিল। কিন্তু তারা যেন একটু কোণঠাসা হয়ে গেছে। গৌরাঙ্গ দিশাকে বলল, 'কোনও বাচ্চার সাধারণ অসুখ করলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

গৌরাঙ্গ বলল, 'ম্যাডাম, আপনি নমস্য।'

দিনটা যে কীভাবে কেটে গেল তা বুঝতেই পারল না দিশা। মুশকিল হল রোগের কথা জানতে চাইলে এই মা-বোনেরা কোনটা রেখে কোনটা বলবে তা নিজেরাই ঠাওর করতে পারে না। বছরের পর বছর লুকিয়ে রাখা সমস্যাগুলো আজ আশ্বাস

পেয়ে একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে সমাধানের জন্যে। এর মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে রোগ বেছে নেওয়ার দায়িত্ব দিশার। মাঝে মাঝে তার অবাক লাগছিল। এতগুলো অসুখ নিয়ে মহিলা বেঁচে আছেন কী করে? আর শুধু বেঁচে থাকা নয়, সংসারের যাবতীয় কাজ মুখ বুজে করে যেতে হয় এদের। আজ পেশেন্ট দেখতে দেখতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সে একটা সিদ্ধান্ত নিল। বেশিরভাগ পেশেন্টের রোগ সঠিক নির্ধারণে রক্ত, ইউরিন পরীক্ষা করানো দরকার, প্রয়োজন এক্স-রে করার। যাদের সামর্থ্য আছে, লোকবল আছে তাদের শহরে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আসতে বলছে। যাদের তা একেবারে নেই তাদের নিয়েই সমস্যা। এদের শহরে যেতে বললে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাবে। একেবারে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে এরা গ্রামেই। অনুমানের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা করা অন্যায়। এডমন্ড হিলারির একটা লেখার কথা মনে পড়ল ওর। এভারেস্টে ইয়েতির খোঁজে একটা বিরাট অভিযান চালিয়েছিলেন তিনি। দলে যিনি ডাক্তার ছিলেন তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে বেস ক্যাম্পে রেখেই ওপরে উঠতে হয়। সেসময় দলের একজন তরুণ সদস্য যিনি স্টেট টিমটার সঙ্গে খুব জড়িত ছিলেন তিনি প্রয়োজনে ইঞ্জেকশন দেওয়ার দায়িত্ব নেন। হিলারি সাহেব ওই তরুণের কাজে খুব খুশি হন। তারপর ফিরে এসে যখন তিনি জানতে পারলেন ওই তরুণ অভিযানের আগে কখনও ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ ধরেনি তখন তাঁর কথা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেই দুঃসাহসী তরুণকে ভর্ৎসনা করতে পারেননি তিনি। প্রয়োজনে সে ভাল ভাবেই কাজ উদ্ধার করে দিয়েছিল।

অতএব দিশা সিদ্ধান্ত নিল যাদের পক্ষে পরীক্ষা করানো সম্ভব নয় এবং অসুখটা সে আন্দাজ করতে পারছে তাদের সে সরাসরি ওষুধ দেবে। তবে তার মাত্রা অনেক কম দেওয়াটাই ঠিক। যদি ওষুধ সাড়া দেয় তা হলে আর চিন্তা নেই। না দিলে বা কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।

সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। একটানা পেশেন্ট দেখে দেখে আর চেয়ারে বসতে পারছিল না দিশা। শিরদাঁড়া টনটন করছিল। এবার পুরনো পেশেন্ট। গতকালের ওষুধ খেয়ে দু'জনের রাত্রে ঘুম হয়নি। ওষুধের মাত্রা কমিয়ে দিল। একজনের গায়ে র‍্যাশ বেরিয়েছে। তার ওষুধ পালটে দিল। এবার সেই মহিলা যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

দিশা তাকে বলল, 'আপনি সকাল সাতটায় আমার বাড়িতে আসবেন।'

'কেন?'

'আপনাকে শহরে নিয়ে যাওয়া হবে। নিশ্চিন্ত থাকুন, কেউ জানবে না।'

'বাড়িতে কী বলে আসব?'

'বলবেন আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে শহরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। এই যে এখানে আসছেন, কী বলে আসছেন?'

'পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে বলেছি।'

'বেশ। তাই বলব। অনেক সময় পেটে ঘা হয়, পাথর জমে।'

'কার সঙ্গে পাঠাবেন?'

'আমার ওপর আপনার ভরসা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে এ নিয়ে ভাববেন না। যান।'

সেই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে তার মা এল। তাকেও একই কথা বলল দিশা। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মা মাথা নাড়ল, 'না দিদি, অন্যের সঙ্গে গেলে তো সব জানাজানি হয়ে যাবে।'

'না হবে না। যে নিয়ে যাবে সেও মেয়ে, কাউকে বলবে না।'

মাথা নাড়ল মহিলা, 'আমি মেয়েমানুষ হয়ে বলছি মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করি না।'

'তার মানে আপনি আমাকেও অবিশ্বাস করেন?'

'না। আপনার কথা আলাদা। আপনি ডাক্তার।'

'তা হলে?' দিশা মনে মনে রেগে গেলেও সেটা প্রকাশ করল না। 'আপনার স্বামীকে বলুন সঙ্গে যেতে। তাঁকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন।'

'তাকে এখনও বলা হয়নি।'

'বেশ তো এবার বলুন।'

'না দিদি। ওর পেটে কথা থাকে না। দুঃখের কথা সবাইকে বলে ফেলবে।'

'দুঃখের কথা মানে? কে বলল আপনাকে। এটা একটা সামান্য দুর্ঘটনা।'

'আমি আমার মাকে নিয়ে যাব।'

'বাঃ। তিনি কোথায় থাকেন?'

'পাশের গ্রামে। আজ এসেছিল আপনাকে দেখাতে। পঞ্চাশ জনের পরে ছিল বলে চলে গেছে। কাল আসবে। আপনি ওকে বলবেন শহরে গিয়ে পরীক্ষা করাতে। তখন ওকে ডাক্তার দেখাতে আমি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাব। কেউ সন্দেহ করবে না।'

'এখানে যে দু'দিন আসলেন, স্বামীকে কী বলেছেন?'

'মিথ্যে বলেছি। বুকে ব্যথা হচ্ছে তাই মেয়েকে নিয়ে ডাক্তার দেখাব।'

'কার বুকে?'

'আমার।'

'ঠিক আছে। আপনার মায়ের নাম বলুন।' কলম নিল দিশা।

'শ্রীযুক্তা হরিমতী দাসী।'

'বেশ। মনে থাকবে।'

পেশেন্ট দেখা শেষ করতে গৌরাঙ্গ এল। 'ম্যাডাম, স্যার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এত রাত পর্যন্ত তো ওঁর থাকার অভ্যেস নেই।'

অতএব যেতে হল। ডক্টর চাকলাদার বললেন, 'আপনি আমাকে পাগল না করে ছাড়বেন না দেখছি। আমাদের ব্লক মেডিক্যাল সেন্টারের ক্ষমতা কতটুকু জানেন না?'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আপনি যে সব ওষুধ প্রেসক্রাইব করছেন তার অধিকাংশই আমাদের স্টকে নেই। যা ছিল তা প্রায় শেষ। কাল থেকে কী হবে?'

'সেকী? সদর থেকে আনিয়ে নিন।'

'বললেই আনানো যায়? সময় লাগবে না? তা ছাড়া আপনি কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছেন যা ব্লাড বা ইউরিন পরীক্ষা না করে দেওয়া যায় না। আপনি সেটা না করিয়ে দিলেন কী করে?' ডক্টর চাকলাদার খুবই বিরক্ত।

'আমি জানি। কিন্তু না দিলে তো আউটডোরে বসাই অর্থহীন হয়ে যায়।'

'মানে?'

'দেখুন প্রতি দশজনে অন্তত ছয়জনকে বলি শহরে গিয়ে রক্ত বা ইউরিন কিংবা স্টুল পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট নিয়ে আসুন। শুনে ওরা এমনভাবে তাকায় যেন আমি ওদের চাঁদে যেতে বলছি। বুঝতেই পারি ও সব করার মতো আর্থিক ক্ষমতা নেই। ওরা বাড়ি ফিরে যাবে এবং বিনা চিকিৎসায় ভুগবে অথবা মারা যাবে।' দিশা বলল।

'ব্যাপারটা কি নতুন? আপনি আসার আগে মেয়েরা এখানে আসত না। তখন তো খুব বেশি মৃত্যুর খবর পাইনি। ছেলেদের পাঠাত, আমরা সিমটম শুনে যা দিতাম তাই খেত। যে শহরে যেতে পারবে না সে পুরনো দিনের মতো চিকিৎসায় থাকবে। আপনি নিশ্চিত না হয়েও ওষুধ দিলে সেই অসুখ না হলে তো পেশেন্টেরই খারাপ হবে। এটা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও। এ রকম করবেন না।' ডক্টর চাকলাদার মুখ কুঁচকে কথা বলছিলেন।

প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না দিশা। ডক্টর চাকলাদার সরকারি মতে যা ঠিক তাই বলছেন। সে আগ বাড়িয়ে যা করতে গিয়েছিল তা আইনসঙ্গত নয়।

অথচ লোক কমছে না। শুধু এই গ্রাম নয়। আশেপাশের গ্রামের মেয়েরাও চলে আসছে তাদের সমস্যা নিয়ে। ইতিমধ্যে সুচেতনার শরীর বেশ অসুস্থ হল। দুটো দিন বিছানায় পড়ে রইল সে। দেখতে গিয়েছিল দিশা। হাঁপ যখন বাড়ছে তখন চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে বেচারার। তবু তার মধ্যে বলল, 'ভয় নেই, মরব না। এদেশের

আমারবই.কম

মেয়েরা সহজে মরে না।' ওর রুমমেট মহিলাও শিক্ষিকা। তিনি গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন।

দিশা তাঁকে বলল, 'এ রকম চললে ওর অক্সিজেন দরকার হবে। সেক্ষেত্রে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। আমি কাল গাড়ি ভাড়া করব।'

'না, না।' ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, 'তার দরকার হবে না। এর আগেও এ রকম হয়েছিল। ওই ঝিলের ধারে গিয়ে ঠান্ডা লাগিয়েছে। কাল সকালে ঠিক হয়ে যাবে।' নির্লিপ্ত গলায় বললেন ভদ্রমহিলা।

কিছু করার নেই। যখন সে ডাক্তারি পড়ার জন্যে কলেজে যেত তখন কত কী ভাবনা ভাবত। সরকার তাকে চাকরি দিল। সেই চাকরির সূত্রে এমন একটা জায়গায় তাকে আসতে হল যেখানে মানুষ অসুখে ভোগে, কষ্ট পায়, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় অথচ ডাক্তার হিসেবে তাকে সে সব নির্বিকার হয়ে দেখতে হবে। কলেজে পড়ার সময় ছেলেরা রসিকতা করত, 'ভাল হয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাবে!' এখানে এসে ওই রসিকতাই সত্যি বলে মনে হচ্ছে। কিছু করার নেই। আমি ঠুঁটো জগন্নাথ বা নিধিরাম সর্দার হয়ে থাকতে চাই না বললে কোনও লাভ হবে না। চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু এই যে মহিলারা তার ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করে আছে, এরা কী করবে? যদিও এদের সম্পূর্ণ সুস্থ করার কোনও ক্ষমতা তার নেই, কিন্তু এরা কাছে এলে সে যে আন্তরিকতা দেখাচ্ছে তাতেই খুশি হয়ে ফিরে যাচ্ছে। দিশা ঠিক করল প্রথার চ্যানেলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখবে। এই ব্লক হেলথ সেন্টারে অবিলম্বে যে যে সুবিধে না থাকলে গরিব মানুষদের চিকিৎসা করা যাচ্ছে না তার তালিকা দিয়ে আবেদন করবে যাতে তিনি ব্যবস্থা নেন।

একদিন ছুটি চাইল দিশা। ডক্টর চাকলাদার আপত্তি করলেন না। আগামী কাল ডক্টরদিদি আউটডোরে বসবেন না তা আগাম জানিয়ে দেওয়া হল। তারপর সেই বিধবা মেয়েটিকে খবর পাঠাল তার দাদাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে দেখা করতে।

বিকেলে বাড়ি ফিরে দিশা অবাক। সুচেতনা বসে আছে। তাকে দেখে সে সুন্দর হাসল। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন আছো?'

'চমৎকার।' মাথা নাড়ল সুচেতনা, 'কাল আমি তোমার অনুরোধমতো শহরে যেতে পারি।'

'পারবে? শরীর অ্যালাউ করবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমার রুমমেট দেখছি ঠিকই বলেছেন। যাচ্ছ যখন তখন নিজেকেও দেখিয়ে এসো।'

'দূর। ঠিক তো হয়ে গেছি।'

'আমিও কাল শহরে যাচ্ছি।'

'যাচ্চলে। তা হলে আমাকে যেতে হবে না?'

'আমি যে কেস নিয়ে যাব সেটা তোমার ঘাড়ে চাপাব না। তুমি একটি বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে সোজা হাসপাতালে যাবে। গাইনকোলোজিস্টকে বলবে ওর বুকে সিস্ট মতন হয়েছে। তিনি নিশ্চয়ই এক্স-রে করাতে বলবেন। ওখানেই এক্স-রে করিয়ে রিপোর্ট নিয়ে তাঁকে দেখাবে। তিনি কী বলেন শুনে ফিরে আসবে।'

'মেয়েটা একা যাবে?'

'না, ওর মা সম্ভবত ওর সঙ্গে থাকবে। তুমি দু'শোটা টাকা সঙ্গে রাখো। গাড়ি ভাড়া ছাড়া অন্য খরচ করতে হতে পারে।' ঘরে ঢুকে টাকা বের করে এনে সে সুচেতনাকে দিল।

টাকাটা হাতে নিয়ে সুচেতনা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল দিশার দিকে।

দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'তুমি এভাবে কত মানুষের চিকিৎসার জন্যে টাকা দিতে পারবে?'

'জানি না। কিন্তু ওইটুকু বাচ্চা মেয়েকে মরে যেতে দেখতে পারব না। তা ছাড়া নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্যেও তো কিছু করা দরকার।'

'তা হলে কখন রওনা হবে?'

'প্রথম বাস তো সকাল সাতটায় পাওয়া যায়।'

'হ্যাঁ। আমি বাসস্টপে থাকব।' উঠে পড়ল সুচেতনা।

'কোথায় চললে?'

'একটু ঘুরে আসি!' সুচেতনা সুন্দর হাসল।

'ঝিলের ধারে যেয়ো না। একটু বাদেই অন্ধকার নেমে আসবে।'

সুচেতনা কোনও জবাব না দিয়ে চলে গেল। দিশার সন্দেহ হল ও ঝিলের দিকেই যাচ্ছে। ঝিল ওকে এত টানে কেন? কেউ কি ওখানে ওর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে? হয়তো প্রেমে পড়েছে মেয়েটা।

সন্ধের মুখে ওরা হাজির হল। গোবেচারা চেহারার এক প্রৌঢ় আর বিধবা মেয়েটি। প্রৌঢ় তাকে নমস্কার করল। দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ওর দাদা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বোনের পেটে ঘা হয়েছে। ঠিক সময়ে খেত না?'

'গরিবের ঘরে কি খাওয়ার ঠিক থাকে দিদি। ছেলে ডাক্তার দেখবে বলে ওর অসুখের কথা কখনও বলেনি। এখন তো গ্রামের সব মেয়েমানুষের রোগ একসঙ্গে

ধরা পড়ছে। তা আমাকে কী করতে হবে বলুন?'

'ওই অসুখের চিকিৎসা এখানে হয় না। শহরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে রোগ কী রকম তা ধরার পর ওষুধ দিতে হবে। আমি কাল শহরে যাব। আপনারা ওকে নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে পারেন।' দিশা বলল।

'কাল! ও একা আপনার সঙ্গে গেলে হয় না?'

'ঠিক আছে, কাল ঠিক সকাল সাড়ে ছটায় তুমি এখানে চলে আসবে।' মেয়েটির উদ্দেশে বলতেই সে দ্রুত মাথা নাড়ল।

'কত দিতে হবে?' প্রৌঢ় হাতজোড় করল।

'শুধু গাড়ি ভাড়া দিলেই হবে।' দিশা ভেতরে চলে গেল।

কিন্তু বাচ্চা মেয়েটার বেলায় এত সহজে কাজ হয়নি। তার মা কিছুতেই রোগা মাস্টারনির সঙ্গে যাবে না। প্রথমে বলল, 'আপনি সঙ্গে থাকলে ভরসা পেতাম, কিন্তু রোগা মাস্টারনি ফিরে এসেই কথাটা পাঁচ কানে ছড়িয়ে দেবে।'

'আপনি ভুল ভাবছেন। ও তেমন মেয়ে নয়।'

'আপনি নতুন এসেছেন, ভাল মানুষ, আপনি জানেন না!'

'আপনারা কী জানেন?'

'রোগা মাস্টারনির চরিত্র ভাল নয়।' নিচু গলায় বলল মা।

'সেকী?'

'হ্যাঁ দিদি। দেখবেন রোজ ঝিলের ধারে যায়।'

'সে তো ওখানে বেড়াতে যায়।'

'বাবা! ঝিলের ধারে বেড়াতে যেতে আমার মতো বুড়ো মাগির হাত পা ভয়ে ঠান্ডা হয়ে যায় আর তিনি—সেখানে ছেলে আসে।'

'আসুক গে। আপনার তাতে কী দরকার? আমি কথা দিচ্ছি ও কাউকে বলবে না। যদি বলে আমি দায়ী থাকব।'

'কিন্তু—।'

'কোনও কিন্তু নয়। আপনি আপনার মেয়েকে বাঁচাতে চান কি চান না?'

'চাই। কিন্তু বাড়িতে কী বলব?'

'বলবেন আপনার মেয়ের বুকে ব্যথা হচ্ছে বলে আমি শহরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করাতে বলেছি। স্কুলের দিদিমণি নিয়ে যাবে।'

'কখন যেতে হবে?'

'কাল পৌনে সাতটার সময় বাসস্টপে পৌঁছে যাবেন।'

'কত টাকা লাগবে? আমার হাতে মাত্র পঞ্চাশ টাকা আছে।'

'কাল কিছু লাগবে না। আমি দিদিমণিকে টাকা দিয়ে দিয়েছি।'

ওরা বেশ দ্বিধা নিয়ে চলে গেল। দিশার মনে হল কাল হয়তো সুচেতনাকে বাসস্টপ থেকে ফিরে আসতে হবে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে হঠাৎ সূর্যর মুখ মনে পড়ল। এই ক'দিন সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ত যে বিছানায় শোওয়া মাত্র ঘুম যেন আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে আঁকড়ে ধরত। সূর্য এখন কী করছে? কেমন করে কী হয়ে গেল। সূর্য যেন অনেক দূরের মানুষ এখন। অথচ সে যদি সব ছেড়ে কলকাতায় চলে যায় তা হলেই আর কোনও দূরত্ব থাকে না। সেই চলে যাওয়াটা তার মধ্যে সম্ভব হচ্ছে না কেন? এখানে প্রতিদিন সে একটু একটু করে এইসব অসহায় মানুষের সঙ্গে যত জড়িয়ে পড়ছে তত—। কেঁদে ফেলল দিশা। প্রথমে নিঃশব্দে, পরে সশব্দে।

নীচের বিছানা থেকে দ্রুত উঠে এল যশোমতী, 'ও দিদি, তুমি কাঁদছ কেন? ও দিদি। মন খারাপ করছে? ও দিদি!'

নিজেকে শান্ত করল দিশা। বলল, 'ঠিক আছে, তুই শো।'

'পায়ে হাত বুলিয়ে দেব?'

'নারে। শুয়ে পড়।'

সুচেতনা জিজ্ঞাসা করছিল কত লোকের পেছনে টাকা খরচ সে করতে পারে। চাকরি করছে। তার মাইনের টাকা শ্বশুরবাড়ি নেবে না। বউমা বলেই হয়তো, সে যদি সূর্যর ভাই হত তা হলে অবশ্যই নিত। তাই ওই টাকার কিছুটা এভাবেই খরচ হোক না।

সাড়ে ছটায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল দিশা, মহিলা আসামাত্র রওনা হল। যশোমতীকে বুঝিয়ে বলা ছিল যাতে সে একা থাকতে পারে। কথা দিতে হয়েছিল সন্ধের মধ্যে ফিরে আসবে। মহিলা তার থেকে বয়সে অনেক বড়। অথচ শহরে যাবে বলেই হয়তো সস্তার পাটসিল্কের শাড়ি পরেছে যার রং বেশ ক্যাটকেটে। হয়তো এটাই ওর একমাত্র শাড়ি। হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, 'শোনো, এখন থেকে তোমাকে আমি যমুনাবালা বলে ডাকব।'

'কেন?'

'তোমার নিজের নামে যদি হাসপাতালে ভরতি হও তা হলে আপত্তি নেই তো?'

'না না। যদি কেউ জেনে যায়। নাম ঠিকানা থাকলে গ্রামে খবর এসে যাবে।'

'তা হলে যমুনাবালাই ঠিক থাকল। ডাকলে দয়া করে সাড়া দিয়ো।' দিশা বলল

আমারবই.কম

বটে কিন্তু মনে খচখচ করতে লাগল। হাসপাতালে বেনামে চিকিৎসা করানো অত্যন্ত অন্যায়, আইনবিরুদ্ধ কাজ। একজন ডাক্তারের উচিত নয় কাউকে সেটা করতে উৎসাহিত করা। কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক নাম মানে ভবিষ্যতে অন্ধকার ডেকে নিয়ে আসা। এথিক মানতে গিয়ে কারোর সর্বনাশ হলে কী করা উচিত! হাসপাতালের খাতায় যে নামই দেওয়া হবে সেটা শুধু নিয়ম-মানার কারণে। সবই ঠিক, তবু অস্বস্তি গেল না।

দূর থেকে বাসস্টপ দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল মহিলা, 'ওরে বাবা।'

'কী হল?'

'না, যাব না।'

'কেন?'

'চামেলি বউদি মেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

দিশা দেখল সুচেতনা ওদের সঙ্গে কথা বলছে, তাদের দেখতে পায়নি।

'তো কী হয়েছে?'

'ভীষণ কথা ছড়ায়। এর কথা ওকে বলে। ও সবার কেচ্ছার খবর রাখে।'

'তুমি পেটের ঘায়ের চিকিৎসা করাতে যাচ্ছ, তোমার ভয় কী?'

'ও নিশ্চয়ই রোগা মাস্টারনির সঙ্গে বাসে উঠবে। ও দিদি, এই বাস নয়, পরের বাসে যাব আমরা। তোমার পায়ে পড়ি—।'

বলতে না বলতেই বাস এসে গেল। দূরত্বটা এতখানি না চেঁচালে বাসের ড্রাইভার অপেক্ষা করবে না। সুচেতনারা উঠে যেতেই বাস ছেড়ে দিল।

'কী ব্যাপার দিদি, কোথায় চললেন?'

গলা শুনে দোকানদারকে দেখতে পেল দিশা। হাতে বাজারের থলে।

'শহরে।'

'পেশেন্ট নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি, আপনি যা করছেন তার তুলনা নেই।'

'না না, এ কী বলছেন। আচ্ছা, পরের বাস কখন?'

'এখন পরপর তিনটে বাস। এখনই পেয়ে যাবেন।' লোকটি চলে গেল।

পরের বাস এল মিনিট কুড়ি পরে। মহিলার ওপরে খুব রাগ হচ্ছিল। কিন্তু ওর ভয়ের তো যথেষ্ট কারণ আছে। যে ঘটনার জন্যে আজ ওকে শহরে যেতে হচ্ছে তার জন্যে ওর কোনও ভূমিকা ছিল না। তবে একটা প্রশ্ন জাগেই, যখন হোটেলের ঘরে ওর দেওর ওকে ধর্ষণ করল তখন ও চিৎকার করল না কেন? চিৎকার করে বাধা

দিলে লোকটা ধরা পড়ে যেত, শাস্তি হত। তারপরেই খেয়াল হল, সেই সঙ্গে মহিলার গ্রামে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যেত চিরদিনের জন্যে। এইভাবে মুখ বুজে কিল খাওয়া শুধু এদেশের মেয়েদেরই খেতে হয়।

বাসে উঠে লেডিস সিটে বসে দিশা দেখল মহিলা ঘোমটা টেনে দিয়েছে।

নিজের পরিচয় দিতে কাজ হল। যমুনাবালার ইউরিন পরীক্ষা করে রিপোর্ট জানা গেল মুখে মুখেই। পজিটিভ। যমুনাবালা ঘোমটা মাথায় দিয়ে বসে ছিল। দিশা একটু ফাঁপরে পড়ল। মহিলা সময়টা ঠিকঠাক বলছে তো? আলাদা ডেকে সে প্রশ্ন করল, 'ঠিক কবে গিয়েছিলে তোমার দেওরের সঙ্গে, মনে আছে?'

'হ্যাঁ। দু'মাস, না মাস তিন হয়ে গেল।'

'ঠিক তিনমাস তো, না তার বেশি?'

'তার আগের দিন পূর্ণিমা ছিল।' ঘোমটা টানল যমুনাবালা।

'ওঃ। পূর্ণিমা তো প্রত্যেক মাসেই থাকে।' দিশা বুঝল প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই।

অ্যাবরশনের জন্যে হাসপাতাল থেকে যে দিনে আসতে বলা হল সেদিন দিশার পক্ষে যেমন আসা সম্ভব নয় তেমনই ওই মহিলাও একা আসবে না। সে সোজা ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল। ভদ্রলোক দিশাকে দেখে অবাক, 'আপনিই সেই ডাক্তার?'

'মানে?'

'মারাত্মক কাণ্ড করেছেন প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে বসে। আপনাকে নিয়ে অনেক গল্প ছড়িয়ে গেছে এর মধ্যে।' ডাক্তার হাসলেন।

'কী রকম?'

'কেউ বলছে আপনি নাইটিঙ্গেল, কেউ লেডি রবিনহুড। আপনাকে ঘিরে গ্রামে নারীজাগরণ হয়েছে। আপনি কোনও প্রটোকল মানেন না।'

'একদম বাজে কথা। আমি খুব সাধারণ আর ডাক্তারির সামান্যই জানি।'

'বেশ, বলুন কী করতে পারি?'

সমস্যাটা বলল সে। যমুনাবালাকে আজই মুক্ত করে না নিয়ে গেলে ওর জীবন অন্ধকার হয়ে যাবে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'সঙ্গে কেউ এসেছে?'

'না। যে আসত সে-ই ওর সর্বনাশ করত গল্প ছড়িয়ে।'

'তা হলে সই করবে কে?'

'আমি।' গম্ভীর হয়ে বলল দিশা।

'ঠিক আছে, আমি এখনই করে দিচ্ছি। কিন্তু আপনি সঙ্গে থাকবেন।'

বেলা দশটায় যখন যমুনাবালাকে বেডে শোওয়ানো হল তখন সে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'ও দিদি, আমাকে কী করবে?'

'দেওর তোমার শরীরে যেটি দিয়েছে তা বের করে দেওয়া হবে।'

'আচ্ছা দিদি, আপনাকে একটা কথা বলব?'

নিচু গলায় বলল যমুনাবালা।

'বলো।'

'আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন?'

'মানে?' হাঁ হয়ে গেল দিশা।

'আমি বিনিপয়সায় রান্না করে দেব। গ্রামের কেউ জানবে না। পেটে যেটা এসেছে সেটা ওখানেই বেরিয়ে আসুক। আমার তো কখনও বিয়ে হবে না, বাচ্চা হবে না। এটাকে নিয়েই না হয় থাকব। নিয়ে যাবেন দিদি?' দু'চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার।

দিশা থমকে গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বাচ্চা চাও?'

চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল যমুনাবালা।

'এ কথা আগে বলনি কেন?'

'তখন তো পালিয়ে যাওয়ার কথা মনে আসেনি। এখানে এসে একটা মেয়েকে দেখলাম, কোলে তিনদিনের বাচ্চা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। দেখে বড় লোভ হচ্ছে দিদি।'

দিশা কী করবে বুঝতে পারছিল না। ইতিমধ্যে ডাক্তার এলেন, 'এনি প্রব্লেম?' দিশার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তার মনে ঝড় বইছে। সে সমস্যাটা জানাল।

ডাক্তার গম্ভীর হলেন, 'এই মহিলা বিধবা, বয়স কত?'

'পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেছে বলে মনে হয়।'

'সুতরাং আর বিয়ের সুযোগ নেই। গ্রামে থেকে তো নয়ই।'

'হ্যাঁ।'

'অথচ এখন ওর মনে হচ্ছে বাচ্চাটাকে রাখলে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে যা সে কোনওদিন পারবে না। কিন্তু ওর শরীরে বাচ্চা এসেছে এটা জানাজানি হলে—?'

'ওকে আত্মহত্যা করতে হবে। ইন ফ্যাক্ট একবার করতেও গিয়েছিল!'

'কিন্তু গ্রামের বাইরে কে ওকে আশ্রয় দেবে? কলকাতা নিয়ে গিয়ে মাদার তেরেসার হোমে ভরতি করানো যায়, আমার এক বন্ধু ওখানকার ডাক্তার, কিন্তু

তারপরে? এই খবর তো চাপা থাকবে না! সত্যি কথা কী, আমার স্ত্রী ওকে বাড়িতে রাখতে রাজি হবেন না।'

খুব নিচু গলায় দিশা বলল, 'যা করার কথা তাই করে দিন।'

'আর ইউ শিওর।'

'একটা লোক ও রকম অসহায় মহিলাকে ভুলিয়ে শহরে নিয়ে এসে রেপ করায় ওর শরীরে সন্তান এসেছে। যার রক্ত নিয়ে সন্তানটি পৃথিবীতে আসবে সে কখনই ওর উপকারে আসবে না।'

যমুনাবালার শরীর পাপমুক্ত হল বেলা বারোটায়। সে চারটের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে। তাই শেষ বাসটা ধরা ছাড়া কোনও উপায় নেই। অর্ধচেতন যমুনাবালা শুয়ে রইল বিছানায়। দিশা বাইরে বেরিয়ে আসতেই ওদের দেখতে পেল। এক্স-রে ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে ওরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। সুচেতনা এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'এই তো। এক্স-রে হয়ে গিয়েছে?'

'আর বোলো না। এক্স-রে মেশিন ছেলেরা অপারেট করে বলে ইনি মেয়েকে তার সামনে যেতে দেবেন না। অনেক কষ্টে কাজ উদ্ধার করেছি।' সুচেতনা বলল।

'কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ। পজিটিভ। টিউমার।'

'তা হলে তো সার্জেনকে দেখাতে হয়।'

'সার্জেন আজ আসেননি। সামনের সোমবার আবার আসতে হবে।'

'কে নিয়ে আসবে? তোমার তো স্কুল খুলে যাবে।'

'হ্যাঁ।' ঘড়ি দেখল সুচেতনা, 'তুমি মেয়েটার বাবাকে ডেকে সব খুলে বলো। মেয়েকে বাঁচাবার ইচ্ছে থাকলে বাপ নিজেই মেয়েকে নিয়ে আসবে।'

'এ ছাড়া তো কোনও উপায় দেখছি না।' বলার সময় দিশা নিশ্চিত ছিল না ব্যাপারটা আদৌ সম্ভব হবে কিনা! সে দূরে দাঁড়ানো মা মেয়েকে দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ওদের কিছু বলেছ?'

'না। বলতে পারলাম না।' সুচেতনা ঠোঁট কামড়াল।

'কিন্তু বলতে তো হবেই।' দিশা এগিয়ে গেল। ওদের সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের খিদে পায়নি?'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

'চলো, কোথাও গিয়ে খাওয়া যাক।'

হাসপাতালের বাইরে একটা পাইসহোটেলে ওরা ডালভাত আর মাছের ঝোল

আমারবই.কম

খেল। তারপর বেরিয়ে এসে দিশা মাকে বলল, 'শুনুন, আপনার মেয়ের কী অসুখ তা ছবিতে ধরা পড়েছে। এই অসুখ ওষুধ দিয়ে সারানো যাবে না।'

'তা হলে?' মহিলার মুখ কালো হয়ে গেল আরও।

'একটা ছোট্ট অপারেশন করতে হবে। তার দাগ এত অল্প থাকবে যে কেউ বুঝতে পারবে না। বুঝতে পেরেছেন?'

'অপারেশন? ওরে বাব্বা! না না।'

'কোনও ভয় নেই। দু'-তিন দিনের ব্যাপার। কেউ জানতে পারবে না। আর যদি তা না করান তা হলে ওকে বাঁচানো যাবে না। ভেতরে ভেতরে ঘা হয়ে সব পচে যাবে।'

'কিন্তু দাগ থাকলে বিয়ে দেব কী করে?'

'অপারেশন না করালে ওর বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত ও সুস্থ থাকবে না।'

'কতদিন পরে ওর অসুখ বাড়বে?'

'বড়জোর মাস ছয়েক।'

'তা হলে এর মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে।'

'মানে?'

'ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আর মাত্র পনেরো দিন পরেই বিয়ে।'

'সর্বনাশ! এই অবস্থায় ওর বিয়ে দেবেন?'

'বিয়ে হয়ে গেলে ওরা যা করার করবে।'

'এটা ঠিক নয়। আপনি ওর জীবন নষ্ট করছেন, ওর বরের জীবনটাও শেষ করে দিতে যাচ্ছেন।' খুব রেগে গেল দিশা।

'কী করব বলুন। আমরা গরিব মানুষ, মেয়ের বিয়ে তো দিতে হবে।'

'ওইটুকু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, আপনাকে তো পুলিশ ধরবে।'

'কী যে বলেন দিদি। পুলিশ কি মেয়ের বয়স হলে বিয়ে দিতে আসবে? আমরা পুলিশকে ভয় করি না।'

'যা ইচ্ছে তাই করো। কিন্তু আমার কাছে আর এসো না।'

মা চুপ করে রইল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে খুব মায়া লাগল দিশার। সে ঠিক করল গ্রামে ফিরে ওর বাবার সঙ্গে কথা বলবে।

সুচেতনা অন্য কথা বলল, 'দ্যাখো, পনেরোটা দিন এমন কিছু বেশি সময় নয়। বিয়ে এরা দেবেই। বিয়ের পর ওর স্বামী যখন ব্রেস্টের ব্যাপারটা আবিষ্কার করবে তখন এই মেয়েই বলবে সে কিছু জানে না।' স্বামীর যদি অবস্থা ভাল হয় তা হলে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। তাতে যদি এর

ভাগ্যে অপারেশনটা হয়ে যায়—!'

দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার হবু জামাই কী করে?'

'বাসের ড্রাইভার।'

সুচেতনা ওদের নিয়ে ফিরে গেল। দিশা কাজ আছে বলতেই সে ফিরে যাওয়ার জন্যে যেন ছটফট করতে লাগল। ব্যাপারটা চোখে পড়ল দিশার কিন্তু কারণ ধরতে পারল না। বিকেল চারটে নাগাদ যমুনাবালা মোটামুটি সুস্থ। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করল দিশা। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হল কিন্তু আমার নাম আপনি জানেন না।'

'জেনে গেছি।'

'এখন মহিলাকে নিয়ে ফিরে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আজ রাতে ও রেস্টে থাকলে ভাল হত।'

'কিছু করার নেই। ওর বাড়ি যদি অ্যালাউ করে তা হলে রেস্ট পাবে।'

'ও হ্যাঁ, ডক্টর রায়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

'না তো! উনি এখানে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। যাওয়ার আগে দেখা করে যাবেন। ওঁকে এই ঘটনাটা বলেছি।'

দিশা ছুটল। ডক্টর শান্ত রায় সুপারিন্টেডেন্ট ডাক্তারের চেম্বারে বসে ছিলেন। খবর পাঠাতেই বেরিয়ে এলেন, 'আরে! কী খবর?'

'কবে ফিরলেন?'

'আজ সকালে। তোমার বাড়িতে খবরটা দিয়ে দিয়েছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

'সো, তুমি খুব জনপ্রিয় হয়েছ?'

'মানে?'

'শুনলাম মেয়েরা এতদিনে আস্থা পাওয়ার মতো একজনকে খুঁজে পেয়েছে।'

'আমার বদলে অন্য কোনও মেয়ে হলে একই ব্যাপার হত!'

'তাই? তিনি কি একটি মহিলাকে বাঁচাতে শহরে নিয়ে আসতেন নিজের পয়সা খরচ করে? আমার বেশ সন্দেহ আছে।'

'ওর কোনও উপায় ছিল না স্যার।'

'একটা খবর দিই। তোমার শাশুড়ি আগামী পরশু তোমার কাছে আসছেন।'

'উনি আসছেন?' চিৎকার করে উঠল ছেলেমানুষের মতো দিশা।

'হ্যাঁ। আমাকে টেলিফোনে তাই বললেন।'

'একা আসছেন? না ও—।'

'একাই আসছেন।'

'ওঃ, খুব ভাল হবে।'

'দিশা, এখন বোধহয় ফিরে যাওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ স্যার। নিশ্চয়ই।'

'একটা কথা। খারাপ কথা। নিজেকে তার জন্যে তৈরি করো।'

'কী কথা স্যার?'

'দ্যাখো, জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপ কারও ফুল বিছানো হতে পারে না। কাঁটা পড়বেই পায়ের নীচে। অবশ্য যারা হাঁটে না তাদের এই ভয় নেই। তুমি হাঁটছ তাই পা ক্ষতবিক্ষত হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই জেতে যারা এগিয়ে যায়।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না স্যার।'

'একটু ধৈর্য ধরো। শুধু জেনো, ওই সময়ে আমি তোমার পাশে আছি।'

অবাক হয়ে তাকাল দিশা।

'এসো'। ডক্টর রায় বললেন।

যমুনাবালা শহরের মেয়ে নয়। এত দ্রুত সে শক্ত হয়ে যাবে তা কল্পনা করেনি দিশা। সে বাসে বসে জানিয়েছে তার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বাস থেকে নামার পর বলেছে, 'দিদি, আপনি খুব ভাল।'

'হঠাৎ?'

'আপনি যে তখন আমার কথা শোনেননি, কী যে উপকার করেছেন!'

'কেন?'

'সারাজীবন চোরের মতো বাচ্চা মানুষ করতে হত। বুক ফুলিয়ে নিজেকে তো ওর মা বলতে পারতাম না। যার বাপ নেই তার কী পরিচয়?'

দিশা হতবাক। বাস থেকে নেমে দিশা দেখল যমুনাবালা সোজা তার দাদার বাড়িতে চলে গেল।

বাড়িতে ফিরতেই যশোমতী চিঠিটা দিল। স্বাস্থ্যদপ্তর জানাচ্ছে এক্তিয়ার বহির্ভূত অপারেশন করার কারণে তাকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। তাকে অবিলম্বে সরকারি বাসস্থান ছেড়ে দিতে হবে। তার আচরণ সম্পর্কে ডিপার্টমেন্টাল এনকুয়ারি শুরু

হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠি হাতে নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল দিশা।

দিকে দিকে এই বার্তা রটে গেল।

পরের দিন পিলপিল করে তিন-চার গ্রামের মেয়েরা এসে হাজির ব্লক হেলথ সেন্টারে। ডক্টর চাকলাদারের সামনে বসেছিল দিশা।

ডক্টর চাকলাদার বললেন, 'সর্বনাশ! আপনি চলে গেলে কী হবে?'

'আমি তো চলে যেতে চাইনি।' দিশা বলল।

'কী দরকার ছিল উগ্রপন্থীর পা থেকে বুলেট বের করার।'

'আমি একজন ডাক্তার।'

'হুঁ।'

দিশা বাইরে বেরিয়ে আসতেই চিৎকার শুরু হয়ে গেল। মহিলারা তাকে চলে যেতে দেবে না। তুমি চলে গেলে আমরা মরে যাব। ঠিক তখনই পুলিশের জিপ এসে হাজির হল।

ওসি নেমে এলেন। মহিলাদের ভিড়ের দিকে তাকালেন। তারপর দিশার সামনে এসে বললেন, 'ম্যাডাম, এস পি-র হুকুম আপনাকে জানাচ্ছি। উগ্রপন্থীদের সাহায্য করার অপরাধে আপনার বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্ত করবে। ততদিন আপনি এখান থেকে বাইরে যেতে পারবেন না।'

'ও। কোথায় থাকব আমি?'

'কেন?'

'আমাকে ডিপার্টমেন্ট কোয়ার্টার্স ছেড়ে দিতে বলেছে।'

'এটা আপনার সমস্যা ম্যাডাম।' ওসির মুখে হাসি ফুটল, 'আমি শুধু আপনাকে জানাচ্ছি, আমার থানার এলাকার বাইরে আপনি যেতে পারবেন না।'

'কিন্তু কেন? আপনি কি আমাকে অপরাধী বলে মনে করছেন?'

'যেহেতু আপনি উগ্রপন্থীদের সাহায্য করেছেন তাই আপনাকে অন্য কিছু ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু আপনি ডক্টর, সরকারি ডক্টর তাই আপনাকে অ্যারেস্ট করছি না। আপনার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার পর আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নেব।' ওসি বললেন।

'আশ্চর্য ব্যাপার!' খেপে গেল দিশা, 'আমাকে সরকারি কোয়ার্টার্স ছেড়ে দিতে হবে, কোথায় থাকব আমার জানা নেই, অথচ আপনি বাইরে যেতে নিষেধ করছেন। এটা কী করে সম্ভব? তা হলে আপনি আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিন।'

'ডক্টর আপনি উত্তেজিত তাই বাড়তি কথা বলছেন। আপনাকে কি আপনার

আমারবই.কম

ডিপার্টমেন্ট আজকেই বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছে?'

'অবিলম্বে মানে কী?'

'ওটা কথার কথা। আপনি অন্তত এক মাস এখানে থাকতে পারেন। আচ্ছা, আমি আপনার ব্যাপারে ডক্টর রায়ের সঙ্গে কথা বলব।' ওসি ওর পাশ কাটিয়ে ডক্টর চাকলাদারের ঘরে ঢুকে পড়লেন। দিশা নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ধরল মেয়েরা, 'দিদি, আপনি চলে যাচ্ছেন? দিদি আপনাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলেছে? দিদি পুলিশ আপনার চাকরি খেয়েছে? ও দিদি, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না। দিদি, আপনি চলে গেলে আমরা কার কাছে যাব?' গৌরাঙ্গ ছুটে এল, 'আরে! দিদি কি এখনই চলে যাচ্ছেন? ওকে বিরক্ত কোরো না, সরে যাও ওঁর যাওয়ার রাস্তা করে দাও।'

দিশা ফিরে এল কোয়ার্টার্সে। যশোমতী বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখামাত্র জিজ্ঞেস করল, 'ও দিদি, তুমি কি কলকাতায় চলে যাচ্ছ?'

'কেন?' দিশা অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'তা হলে আমার কী হবে? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে তো?'

'তোকে! তোর বাবা-মা এত কাছে থাকে, তাদের ছেড়ে অত দূরে যেতে পারবি?'

'কলকাতা কতদূর দিদি?'

'অনেক দূর! অ-নে-ক।'

মেয়েটার মুখে মেঘ জমল, সরে গেল সামনে থেকে।

দুপুরে দিশা চিঠি লিখল সূর্যকে। সোজাসুজি সব কথা লিখে শেষ করল এইভাবে, 'এই হল ঘটনা। আমি এখনও মনে করি না আমি কোনও অন্যায় করেছি। তুমি তো ঘটনাটা জেনে গিয়েছিলে। তখন বুঝিনি তার প্রতিক্রিয়া এত দূরে পৌঁছোবে। ঠিক করেছি পুলিশ আগে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করুক তারপর আইনের আশ্রয় নেব। চাকরির ব্যাপারটা যেমন ঘটবে তেমন মোকাবিলা করতে হবে। এ সব নিয়ে খুব বিচলিত নই আমি। কিন্তু এখানে, এই কয়দিনে আমি নিজের আর একটি দিক খুঁজে পেয়েছি। এখানকার মেয়েরা তাদের নানা অসুখ নিয়ে ছুটে এসেছে আমার কাছে। আমার আগে তাদের বেশিরভাগই কখনও কোনও ডাক্তারের কাছে যায়নি। এ সব অসুখের কথা কলেজে পড়ার সময় জেনেছি, তার প্রতিবিধান কীভাবে করতে হবে তা আমাদের শেখানো হয়েছিল। সেই শেখা বিদ্যেটার প্রয়োগ করার কোনও উপায় যদি না থাকে তা হলে কী করতে হবে তা কখনই আমাদের বলা হয়নি। এদের বেশিরভাগকেই গরিব বললে খুব কম বলা হয়। প্রাইমারি হেলথ সেন্টার তো দূরের কথা, ব্লক হেলথ সেন্টারের মাধ্যমে ওদের বেশিরভাগের অসুস্থতার মোকাবিলা

করার কথা স্বাস্থ্যদপ্তর চিন্তা করেনি আজ পর্যন্ত। কলকাতার কোনও অধ্যাপককে যদি ব্রেন ক্যানসারের চিকিৎসা করাতে নিউইয়র্কে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় তা হলে তিনি যে সমস্যায় পড়বেন এখানকার মানুষকে শহরে গিয়ে এক্স-রে করাতে বললে তার চেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। টুকটাক, যার জন্যে ওষুধের চেয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই উপকার পাওয়া যায় তা এদের করতে বলে দেখেছি এরা উপকৃত হয়েছে এবং আমার ওপর আস্থা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি যে কী অসহায় তা আমিই জানি। আর এ সব করতে করতে আমি তো নিজের কথা প্রায় ভুলতে বসেছি। তোমাকে দেখতে না পাওয়ার যে কষ্ট পাহাড়ের মতো আমাকে চেপে ধরেছিল, রাগ কোরো না, সেটা যে কোথায় উধাও হয়ে গেল। তার সাজা এই নয় তোমাকে আমি ভুলে গিয়েছি অথবা ভালবাসি না। আমি শুধু বলতে পারি নিজের মধ্যে আর একটা নিজেকে আবিষ্কার করেছি।'

'আগামীকাল মা আসবেন বলে জানালেন ডক্টর রায়। শুনে এত আনন্দ হয়েছিল তারপরেই খবর পেলাম আমার সাসপেনশনের। এখন তো আমার অঢেল অবসর। এর পরে কোথায় থাকব জানি না। তবু যেখানেই থাকি তুমি এলে দু'জনের জায়গা হবে। আসছ কবে? ঠিক সময়ে তো? তোমার ভালবাসা আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে। দিশা।'

রাত সাড়ে সাতটায় সুচেতনা এল, 'তা হলে সরকার তোমাকে অপছন্দ করলেন।'

'সরকার করল কি না জানি না তবে সরকারি আইন অসন্তুষ্ট হয়েছে।'

'শুনলাম তোমাকে কোয়ার্টার্স ছেড়ে দিতে বলেছে অথচ এখানকার বাইরে যাওয়া চলবে না। একদিকে ভালই হল।' সুচেতনা হাসল।

'তার মানে?'

'এতদিন মানুষজনের চিকিৎসা করতে গিয়ে যা করতে পারোনি তা পারবে।'

'পাগল। আমার সাধ্য কতটুকু?'

'কী করবে ঠিক করেছ?'

'না। ভাবার সময় পাইনি।'

'একটা কথা বলি। এখানকার মেয়েদের তুমি ছেড়ে যেয়ো না।'

'যাব না কিন্তু থাকব কোথায়?'

'সেটা নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার থাকা নিয়ে এর মধ্যেই আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এই এখনই একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।'

'কে?'

'তুমি চেনো।'

'কিন্তু বিনি পয়সায় কেউ থাকতে দেবে কেন আর আমিই বা কেন থাকব?'

'ভাড়া দেবে। সাসপেন্ড হলেও তুমি তো মাইনের কিছু টাকা পাবে।'

'তাই তো। মাথায় ছিল না।'

এই সময় যে ভদ্রলোক এল তাঁকে আশা করেনি দিশা। সুচেতনা বলল, 'আমি আপনার হয়ে আগাম বলে দিয়েছি।'

দোকানদারকে বসতে বলল দিশা কিন্তু দোকানদার মাথা নাড়ল, 'দিদি, সব শুনলাম আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আমার বাড়ির একতলাটা ব্যবহার করতে পারেন।'

'ও বাবা! ওখানে তো অনেক ঘর।'

'তিনখানা। মা আমাকে পাঠিয়েছে আপনার কাছে। মায়ের ইচ্ছে, আপনি আমাদের বাড়িতে থাকুন। ইচ্ছে হলে কালই চলে আসুন।'

'কিন্তু কত ভাড়া তা না জানলে—।' দিশা কথা শেষ করতে পারল না।

'আপনি আমাকে হাজার টাকা দিলে খুব কি অসুবিধায় পড়বেন?'

চটপট ভেবে নিল দিশা। হাতে কিছু টাকা জমেছে। তা ছাড়া মাইনের যে অংশ পাওয়া যাবে তা নিশ্চয়ই হাজার পাঁচেকের কম হবে না। সে বলল, 'তিনটে ঘর আপনি এত কম টাকায় দেবেন?'

'এখানে ভাড়াটে কোথায়? শহরে হলে হাজার চার পেতাম। তা ছাড়া আপনাকে চাইছেন আমার মা। তাঁর ইচ্ছেই আমার কাছে শেষ কথা।'

'বেশ। অগ্রিম কত দিতে হবে?'

'একমাসের অগ্রিম আর কারেন্ট।'

'ঠিক আছে।'

'বাঃ। খুব ভাল হল। আপনার তো কিছু ফার্নিচার লাগবে। দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়। কবে থেকে যাবেন?'

'দু'দিন দেখি।'

ভদ্রলোক চলে গেলে দিশা বলল, 'আমি এতটা আশা করিনি।'

সুচেতনা উঠল, 'চলি।'

'অন্ধকারে যাবে? আমি আলো দিচ্ছি।'

'না গো। একটু একটু চাঁদ উঠেছে, দারুণ লাগছে।'

দিশা সুচেতনার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। আজ আকাশে মেঘ নেই। পূর্ণিমার বেশি দেরি নেই। সারা আকাশ যেন নরম আলোয় নিকিয়ে রাখা হয়েছে। চাঁদ নেই কিন্তু তার আগমনের জন্যে আকাশ উৎসবের সাজে সেজেছে। সেদিকে তাকাতেই

দিশার মনে এল সূর্যর মুখ। সূর্য এখন কী করছে? বুকের মধ্যে একটা ভার প্রবল হতে লাগল। কোনও রকমে বিদায় দিয়ে বারান্দায় চলে এল দিশা। বসতেই মনে হল আকাশটা আরও কাছে নেমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল দিশা। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিল না সে। আর কাঁদতে কাঁদতে তার মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে কেউ কোথাও নেই।

হঠাৎ মাথায় হাত পড়তেই সে চমকে উঠল।

'কেঁদো না দিদি, কেঁদো না।'

চোখ তুলে তাকাল দিশা।

'আমি তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাব। মাঝেমাঝে এসে মাকে দেখে যাব, হ্যাঁ!'

সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল দিশা যশোমতীকে। এই মুহূর্তে একটা স্পর্শ, একটু উত্তাপ তার খুব প্রয়োজন ছিল।

শাশুড়ি বাস থেকে নামতেই এগিয়ে গেল দিশা। কন্ডাক্টর সুটকেস নামিয়ে দিল। দিশাকে দেখে ভদ্রমহিলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন, 'কেমন আছিস? খুব খারাপ, না?'

দিশা হাসল, 'আপনার কোনও কষ্ট হয়নি তো?'

'না। ঘুমিয়ে রাত কাবার করে দিলাম। আমি আসব তুই খবরটা পেয়েছিলি?'

'হ্যাঁ। ডক্টর রায় বলেছিলেন।'

'টেলিগ্রাম পাসনি?'

'না তো।'

'তোর শ্বশুর আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করেছিল আমার আসার খবর জানিয়ে। হঠাৎ কী মনে হল জোর করে চলে এলাম।' শাশুড়ি হাসলেন।

'খুব ভাল করেছেন। চলুন।'

সুটকেসটা বেশ ভারী। দিশা সেটাকে তুলে বুঝতে পারল। শাশুড়ি বললেন, 'তুই একা পারবি না, দু'জনে দু'দিকে ধরি আয়।'

এই সময় একটা লোক এগিয়ে এল, 'দিদি, আমাকে দিন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।'

'আপনি—।' দিশা বুঝতে পারছিল এই লোকটি মজুরশ্রেণীর নয়।

'আপনার ওষুধে আমার বউয়ের খুব উপকার হয়েছে দিদি।'

দিশা বুঝতেই পারছিল না ওর বউ কে। এই কয়েকদিনে প্রচুর মহিলাকে সে দেখেছে, তাদের কেউ নিশ্চয়ই। লোকটি সুটকেস নিয়ে এগিয়ে গেল। ওর পেছনে হাঁটতে হাঁটতে শাশুড়ি বললেন, 'তোকে এখানকার মানুষ বেশ ভালবাসে, না?'

'জানি না।' হাসল দিশা।

যেতে যেতে শাশুড়ি বললেন, 'খুব ভাল লাগছে তোর জায়গাটা। কতদিন পরে কলকাতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলাম।'

কোয়ার্টার্স দেখে শাশুড়ি খুব খুশি। যশোমতীকে দেখে অবাক। ওইটুকুন মেয়ে এত কাজ করে শুনে যশোমতীর থুতনি নেড়ে দিতে মেয়েটা ওঁর ভক্ত হয়ে পড়ল।

একটু জিরিয়ে নিয়ে স্নান শেষ করে চা খাওয়ার সময় দিশা ওঁকে একটু একটু করে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল।

'সেকী রে! তোর এখন চাকরি নেই?' শাশুড়ি হতভম্ব।

'নেই বলব না, যতদিন ওদের এনক্যুয়ারি শেষ না হচ্ছে ততদিন কাজ করতে পারব না। তাই পুরো মাইনেও পাব না।'

'তা হলে তুই এখানে আছিস কেন?'

'পুলিশও তো এনক্যুয়ারি করছে। তারা খোঁজ করবে আমার সঙ্গে উগ্রপন্থীদের কোনও যোগাযোগ আছে কি না। ওরা আমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করেছে।'

'এ সব কথা সূর্য জানে?'

'হ্যাঁ। আমি চিঠিতে ওকে জানিয়েছি। হয়তো আজই পেয়ে যাবে।'

'তুই দোষ করিসনি তবু শাস্তি পাবি?'

'এটাকে শাস্তি বলে না মা।'

বেলা বাড়ামাত্র দিশা অস্বস্তিতে পড়ে গেল। হেলথ সেন্টারে গিয়ে তাকে না পেয়ে মহিলারা ভিড় জমিয়েছে তার বাড়ির সামনে। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও অসুখ নিয়ে এসেছে, ডাক্তারদিদিকে দেখাতে চায় তারা। বারান্দায় বসে যতটা সম্ভব ওপর ওপর সে পেশেন্ট দেখতে পারে কিন্তু তা আইনসম্মত হবে কি না বুঝতে পারছিল না। ওদের অপেক্ষা করতে বলে দিশা হেলথ সেন্টারে গেল। ডক্টর চাকলাদার গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। দিশাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, 'আপনার সমস্যা বুঝতে পারছি কিন্তু সরকারি বাসভবন বা হেলথ সেন্টারের এলাকার মধ্যে বসে আপনি বোধহয় পেশেন্ট দেখতে পারেন না।'

'ও।' দিশা নিশ্বাস ফেলল।

'তা ছাড়া আপনি প্রেসক্রাইব করলে যদি ওষুধ এখানে থাকেও তা পেশেন্টদের দেওয়া যাবে না। বলতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু এটা আইনের মধ্যে পড়ে।'

'ওষুধ যদি না দেওয়া হয় তা হলে শুধু প্রেসক্রিপশন নিয়ে এরা কী করবে?'

'ঠিকই তো।' ডক্টর চাকলাদার মাথা নাড়লেন।

গৌরাঙ্গ ঢুকল। কথাগুলো তার কানে গিয়েছিল। সে বলল, 'আচ্ছা, ম্যাডামের

প্রেসক্রিপশন মতো আমি যদি নতুন করে লিখে দিই তা হলে তো ওষুধ দেওয়া যেতে পারে।'

'বোধ হয় না। কারণ আপনার তো অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দেওয়ার কথা নয়। দিচ্ছেন বলেই সেটা আইন হয়ে যেতে পারে না। আচ্ছা, এক কাজ করুন, ডক্টর রায় আজ বিকেলে আসতে পারেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে গৌরাঙ্গবাবুর প্রস্তাবটা কার্যকরী করা যায় কি না দেখুন। তবে উনিও আপনাকে আপনার সরকারি বাড়িতে বসে পেশেন্ট দেখতে দিতে পারেন না।' ডক্টর চাকলাদার ঘন ঘন মাথা নাড়লেন।

'আমি হেলথ সেন্টারের বাইরে গিয়ে পেশেন্ট দেখতে পারি?'

'হ্যাঁ। তবে কোনও দক্ষিণা নিতে পারেন না।'

'জানি। তা হলে আমি আজই বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি।'

'তার মানে? বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবেন?'

'সেটা আমার সমস্যা।'

'আহা, আপনাকে তো এখনই বাড়ি ছাড়তে বলা হয়নি।'

'চিঠিতে লেখা ছিল অবিলম্বে। বিলম্ব করা তো আইনবিরুদ্ধ কাজ। আচ্ছা আসি।' বেরিয়ে এল দিশা। গৌরাঙ্গ সঙ্গে এল, 'ম্যাডাম, চিন্তা করবেন না। ডক্টর রায় এলে আপনাকে খবর দেব। আপনি তো নতুন বাড়িতে ভাড়া নিচ্ছেন?'

'নতুন বাড়ি?'

'হ্যাঁ, আমাদের মুদির দোকানদার—।'

'হ্যাঁ। আপনি কী করে জানলেন?'

'এখানে কোনও খবর চাপা থাকে না। কখন যেতে চান?'

'দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে।'

'আমি কয়েকজনকে পাঠিয়ে দেব যারা মালপত্র ওখানে পৌঁছে দেবে।'

'অনেক ধন্যবাদ গৌরাঙ্গবাবু।'

শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বাড়ি দেখতে গেল দিশা। বাড়ি দেখে শাশুড়িও খুশি। বেডরুম এবং রান্নাঘরের দিকটায় যাওয়ার জন্যে আলাদা দরজা আছে। বাইরের ঘরে বসে পেশেন্ট দেখা যাবে। একটা বারান্দাও আছে।

বাড়িওয়ালার অসুস্থ মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দোতলায় উঠল ওরা। পরিচয় করিয়ে দিতেই বৃদ্ধা বললেন, 'ওমা, এ তো বাচ্চা শাশুড়ি!'

শাশুড়ি কিশোরীর মতো লজ্জা পেলেন, 'কী বলছেন! পঞ্চাশে পড়লাম বলে।'

'পঞ্চাশ আর কী এমন বয়স। তা মেয়ে, তোমার বউমাটি বড্ড ভাল। এখানে এসে কত মেয়েদের উপকার করছে। আমি তো ছেলেকে বললাম ওকে এখানে নিয়ে আয়। বাড়িতে একজন ডাক্তার থাকা মানে কত বড় ভরসা পাওয়া তা কী করে বলব!' বৃদ্ধা বললেন।

'খুব ভাল হয়েছে। আমরাও আপনার এখানে ওকে রেখে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব।'

দিশা বলল, 'আমরা আজ দুপুরের পরেই চলে আসতে চাই, অসুবিধে হবে না তো?'

'ওমা! কী কথা! হাত ধুয়ে বসে আছে যে তাকে জিজ্ঞাসা করছে খাবে কি না। চলে এসো, চলে এসো।' বৃদ্ধা হাসলেন।

দিশা ব্যাগ থেকে টাকা বের করছিল, বৃদ্ধা হাত নাড়লেন, 'না না। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কে টাকা পয়সা থাকবে না। তা হলে তো যখনই ডাকব তখনই টাকা বের করতে হবে। ও সব তুমি ছেলের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া কোরো।'

দিশা হাসল, 'আপনার যতবার ইচ্ছে আমাকে ডাকবেন। আমি এখনও সরকারি ডাক্তার, টাকা নেওয়ার কোনও অধিকার আমার নেই।'

শাশুড়ি আসায় সুবিধে হল। জিনিসপত্র প্যাক করে গৌরাঙ্গর পাঠানো লোকদের মাধ্যমে নতুন বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তিনিই নিয়ে নিলেন। শুধু এক ফাঁকে বললেন, 'তোর সরকারি বাড়িতে রাত কাটানোর সৌভাগ্য এ-যাত্রায় আমার হল না।'

'এ যাত্রায় মানে?' দিশা বুঝতে পারল না।

'মানে এবারে। পরের বার যখন আসব তখন তো থাকতেই পারব।'

'যদি ছাঁটাই হয়ে যাই?'

'না। হবি না। ন্যায়ের জয় হবেই।' শাশুড়ি জোর দিয়ে বললেন।

বিকেলের মধ্যে ওরা স্থানান্তরিত হয়ে গেল। যশোমতী খুব খুশি। ওখানে বেচারাকে দিশা বাড়িতে না থাকলে একা পড়ে থাকতে হত। এখানে আশপাশে লোকজন আছে। কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে।

বিকেলে গৌরাঙ্গ এল। দিশা বলল, 'বসুন, চা খেয়ে যাবেন।'

'বাঃ। এর মধ্যেই দেখছি গুছিয়ে নিয়েছেন।'

'যাবতীয় কৃতিত্ব মা আর যশোমতীর।'

'কাল থেকে নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবেন না ম্যাডাম।'

'কেন?'

'সবাই জেনে গেছে, হেলথ সেন্টারে নয়, এখানে এলেই আপনার দেখা পাওয়া যাবে। আপনি এক কাজ করবেন, যে সব ওষুধ হেলথ সেন্টার থেকে দেওয়া সম্ভব তা আমি যাতে দিতে পারি তাই প্রেসক্রিপশনের ওপর জি লিখে দেবেন। ওরা ওটা আমার কাছে নিয়ে এলে আমি সেটা লিখে ওদের দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'না না। দেখুন, আপনি এই ক'দিনেই এদের মনে যে আস্থা এনে দিয়েছেন তার কোনও তুলনা নেই। আমি যদি আপনার কাজটাকে আরও একটু সহজ করে দিতে পারি তা হলেই খুশি হব। ও হ্যাঁ, একটা কথা, আপনার পরামর্শে মাধব গিয়েছিল স্ত্রীকে নিয়ে শহরে। ওরা পরীক্ষা করে অপারেশন করতে চাইছে। ইউটেরাসে টিউমার। সম্ভবত ম্যালিগন্যান্ট। তবে বায়োপসির পর বোঝা যাবে। আগামীকাল অপারেশন হবে। আপনি না পাঠালে বউটা ঠিক মরে যেত। আমি চাইছি ও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক। তা হলে এখানকার অনেক মহিলার মন থেকে ভয় দূর হবে।' গৌরাঙ্গ যশোমতীর কাছ থেকে চায়ের কাপ নিল।

'আচ্ছা, ডক্টর রায় আজ এসেছিলেন?' দিশা জিজ্ঞেস করল।

'না। আসার কথা ছিল, বোধ হয় আটকে গেছেন।' গৌরাঙ্গ বলল।

গৌরাঙ্গ চলে যাওয়ার পর শাশুড়ির সঙ্গে গল্প করছিল দিশা। সূর্য নাকি এখন মাঝরাতে বাড়ি ফিরছে। তার পেশেন্টের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। রাত তিনটের সময় কল এলেও সে অ্যাটেন্ড করতে চলে যাচ্ছে। এত পরিশ্রম করলে শরীর খারাপ হতে বাধ্য। শাশুড়ি বললেন, 'ও এখান থেকে ফিরে গিয়ে কয়েকজনকে বলেছিল তোর জন্যে। কিন্তু এক বছর না গেলে নাকি কিছুই করা সম্ভব নয়।'

সূর্যর জন্যে মন খারাপ হয়ে গেল দিশার। সে নিচু গলায় বলল, 'কী করি বলুন তো? আমি ভেবে পাচ্ছি না মা!'

'একটা কিছু তো করতেই হবে। আগে তোর এই ঝামেলা মিটুক, তারপর ভাবা যাবে। তবে তুই ফোনে বা চিঠিতে সবসময় ওকে মনে করিয়ে দিবি যে তুই আছিস।'

যশোমতী রাতের রান্না শুরু করার মুখে সুচেতনা এল। তাকে দেখে দিশা বলল, 'আর একটা ডিম নে যশোমতী, সুচেতনা আজ রাত্রে এখানে খেয়ে যাবে।'

সুচেতনা হাসল, 'গৃহপ্রবেশের খাওয়া শুধু ডিম দিয়ে? এ রকম ফাঁকিবাজি চলবে না। আজ থাক, বলে আসা হয়নি, আমার খাবারটা নষ্ট হবে। যে দেশের তিনভাগ মানুষ রোজ খেতে পায় না সে দেশের মেয়ে হয়ে অপরাধটা করতে বোলো না।'

'বাব্বা! পারোও।' দিশা হাসল, তারপর শাশুড়ির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত সুন্দর মুখ, ঠিক পদ্মের মতো মুখ, কিন্তু এত রোগা কেন তুমি?'

সুচেতনা হেসে ফেলল, 'পদ্মের মতো মুখ। আপনি ছেলে হলে নির্ঘাৎ প্রেমে পড়ে যেতাম।'

দিশা চোখ পাকালে, 'এই, ফাজলামি হচ্ছে?'

শাশুড়ি বললেন, 'বারে, প্রেমে পড়তে দোষ কী! তা তোমার বাড়ি কি এখানেই?'

'না। নর্থবেঙ্গলে। কপালে এই চাকরি জুটেছিল তাই চলে এসেছি।'

দিশা বলল, 'ও খুব ভাল আবৃত্তি করে।'

'তাই? শুনব একদিন। বসো। দাঁড়িয়ে আছ তখন থেকে।' শাশুড়ি বললেন।

সুচেতনা বসতেই ওর শাড়ির নীচের দিকে নজর গেল দিশার। সে ঝুঁকে হাত বাড়াতেই চোরকাঁটা উঠে এল। দিশা বলল, 'তুমি আবার ঝিলের ধারে গিয়েছিলে?'

'কী করব? ঝিল আমাকে টানে, না গিয়ে পারি না।' সুচেতনা বলল।

সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করতে যাওয়া মহিলার কথা মনে পড়ল। গম্ভীর হয়ে দিশা বলল, 'শোনো, ঝিলের ধারে বন্দুক হাতে কিছু ছেলেকে দেখা গিয়েছে। ওদিকে যেয়ো না।'

'তুমি জানলে কী করে?' সুচেতনা অবাক।

'জেনেছি।'

দিশা লক্ষ করল সুচেতনা কী রকম গম্ভীর হয়ে গেল। সে হেসে বলল, 'এখানকার মেয়েরা তোমার সম্পর্কে গল্প তৈরি করেছে।'

'কী রকম?'

'তুমি নাকি ঝিলের ধারে গিয়ে বিশেষ কারও সঙ্গে দেখা করো।'

'ধ্যাৎ।' মুখে রক্ত জমল সুচেতনার।

শাশুড়ি বললেন, 'লোকে অমন অকথা-কুকথা বলে। কান দিয়ো না।'

সুচেতনা কথা ঘোরাল, 'কাল থেকে এখানেই পেশেন্ট দেখছ?'

'যদি আসে।'

'আসবে মানে? এই রাস্তা ভরে যাবে।' সুচেতনা জোরের সঙ্গে বলল।

'তুমি কখন আসবে? এখানে তো সাহায্য করার কেউ নেই।'

'সকালে তো স্কুলে যেতে হবে। দুপুরের দিক থেকে আসব। যদি তখনও লোক থাকে তা হলে কোনও সমস্যা হবে না।' সুচেতনা বলল।

শাশুড়ি বললেন, 'হ্যাঁরে, সকালের দিকটায় আমি তো তোকে সাহায্য করতে পারি। ঘরে বসে থেকে কী করব?'

'আপনি পারবেন?' সুচেতনা জিজ্ঞাসা করল।

'খুউব। আমার ছেলে ডাক্তার, ছেলের বউ ডাক্তার, আমার মধ্যে ওদের কোনও ছায়া থাকবে না? একটু বলে দিলেই পেরে যাব।' শাশুড়ি বললেন।

সুচেতনাকে এগিয়ে দিতে দিশা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সুচেতনা বলল, 'এটা একদিক দিয়ে খুব ভাল হয়েছে, তুমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে।'

'হয়তো। কিন্তু কী হবে পেশেন্ট দেখে যদি তাদের অসুখ সারাতে না পারি? গৌরাঙ্গবাবু সাহায্য করবেন বলেছেন, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা কতটুকু! পরীক্ষার যন্ত্রপাতি ছাড়া যে চিকিৎসা করা অর্থহীন, আমার তো ক্ষমতা নেই ও সব জোগাবার।' দিশা বলল।

সুচেতনা চুপ করে শুনল। তারপর নিঃশব্দে ফিরে গেল।

সকাল থেকেই ভিড় জমতে শুরু করল। সামনের মাঠের অর্ধেকটা ভরে গেল। ইতিমধ্যে দু'-চারটে ছেলে চলে এসেছে। তারা বলেছে, 'দিদি একদম চিন্তা করবেন না। আমরা ভিড় ম্যানেজ করছি। শুধু বলে দিন আপনি ক'জনকে দেখবেন?'

অবাক হয়ে দিশা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনারা কারা?'

'আমরা বেকার ছেলে। কাজকর্ম নেই, আড্ডা মেরে সময় কাটাই।'

ছেলেগুলোকে কিছু বলতে পারেনি দিশা কিন্তু ওদের কাজ দেখে কৃতজ্ঞ বোধ করল সে। ওরাই সবাইকে জানিয়ে দিল বেলা একটা পর্যন্ত দিদি পেশেন্ট দেখবেন। তারপর একঘণ্টার ছুটি। দুটো থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আবার দেখবেন। যাঁরা দেখাতে চান তাঁরা নাম লিখিয়ে যান।

প্রথমে যে মহিলা ঘরে ঢুকলেন তিনি নিজের সমস্যার কথা বলার আগে দু'হাত তুলে বলতে লাগলেন, 'তুমি আমার মেয়ের বয়সি, আমি দু'হাত তুলে তোমাকে আশীর্বাদ করছি যাতে ভগবান তোমার মঙ্গল করেন। তুমি যে আমাদের ছেড়ে চলে যাওনি, বিনা পয়সায় আমাদের অসুখ দেখছ এ আমরা ভাবতে পারিনি।'

'ঠিক আছে। বসুন, বলুন, আপনার কষ্ট কী?' দিশা হাসল।

'বুক ধড়ফড় করে, দু'পা হাঁটলেই মাথা ঘোরে।'

'ও। আপনি ওই বেঞ্চির ওপরে শুয়ে পড়ুন।'

শাশুড়ি হাঁ হয়ে ব্যাপারটা দেখছিলেন, এবার মহিলাকে সাহায্য করলেন। সেই সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর আগে ডাক্তার দেখাননি?'

'কী করে দেখাব? সব তো ব্যাটাছেলে ডাক্তার, বুকে হাত দেবে।'

'ও। ইনি মেয়ে বলে এসেছেন?'

'সত্যি কথাটা তাই। কিন্তু ইনি শুধু মেয়ে নয়, জগদ্ধাত্রী।'

শাশুড়ি মুখ তুলতেই দিশার সঙ্গে চোখাচোখি হল।

দেড়টার সময় ছেলেরা জোর করে বিরতি ঘোষণা করল। মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল দিশার। বেশিরভাগ অসুখের ওষুধ গৌরাঙ্গর পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না। অনেককেই রক্ত বা ইউরিন, স্টুল পরীক্ষা করাতে হবে। এক্সরে, ইসিজি-র প্রয়োজন অনেকের। এই সব অসুবিধে থাকলে পেশেন্ট দেখে লাভ কী! শুধু স্তোক দিলে তো অসুখ সারবে না।

শাশুড়ি ভেতরে চলে গিয়েছিলেন। ছেলেদের ধন্যবাদ না জানিয়ে দিশা বলল, 'তোমরা এত করছ, কাল থেকে দুপুরে এখানে খাবে।'

'না দিদি, আমরা কিছুই করিনি। আপনি ডাক্তার হয়েও কিনা পয়সায় ঠায় একের পর এক রোগী দেখে গেলেন, এখানে কেউ এ রকম ভাবতে পারে না।' একজন বলল।

'মে আই কাম ইন?'

গলা শুনে চমকে গেল দিশা। ডক্টর চৌধুরী।

'আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য।'

ছেলেরা বিদায় নিল। তারা স্নান-খাওয়া সেরে আসবে। ডক্টর চৌধুরী বললেন, 'তোমার জন্য আমার গর্ব হচ্ছে দিশা। নাউ, আমি তোমাকে তুমি বলছি।'

'আমি কিছুই করতে পারছি না, আমি হেল্পলেস।'

'আই নো দ্যাট। তবে তোমাকে একটা ভাল খবর দিচ্ছি। তোমার আগে যে দরখাস্তটা ছিল, যাতে তুমি অনেক কিছু চেয়েছিলে, তার কয়েকটার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে প্রত্যেক সপ্তাহে দু'দিন ক্যাম্প হবে। তখন রক্ত, স্টুল এবং ইউরিন পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়া হবে। তুমি যে সব ওষুধ চেয়েছিলে তার কিছুটা দেওয়া হতে পারে।' ডক্টর চৌধুরী চেয়ারে বসলেন। দু'হাতে তালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল দিশা, 'ওঃ গ্রেট। এদের যে কী উপকার হবে তা আপনি ভাবতে পারবেন না। কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?' ডক্টর চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি যাদের পাঠাব তাদের পরীক্ষা কি ক্যাম্পে করা হবে?'

'নিশ্চয়ই। তুমি তো এখনও ডিপার্টমেন্টের বাইরে নও। তদন্ত সাপেক্ষে তোমাকে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে, এই পর্যন্ত। দিশা, এক লক্ষ লোকের সামনেও কেউ যদি আমাকে খুন করতে আসে আর নিজের প্রাণ বাঁচাতে যদি তাকে খুন করতে হয় তা হলে পুলিশ তার কাজ করতে বাধ্য। আমাকে গ্রেপ্তার করে বিচার করা হবে।

বিচারে যদি প্রমাণিত হয়, হবেই, আমি বাধ্য হয়েছি খুন করতে তা হলে বিচারক আমাকে মুক্তি দিতে পারেন।'

'যদি না দেন?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।

'অ্যাপিল করতে পারি। এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।'

'জানি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্যে যে সুযোগ সুবিধে আছে তা তারাই গ্রহণ করতে পারে যাদের টাকা আছে। মুন্সেফ কোর্ট থেকে জজ কোর্ট, সেখান থেকে হাইকোর্ট শেষে সুপ্রিম কোর্ট। বিচার চাওয়ার অনেক জায়গা জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত। ধরুন এখানকার কোনও সাধারণ মানুষ, যে শহরে যাওয়ার ভাড়া কষ্ট করে জোগাড় করে সে সুপ্রিম কোর্ট দূরের কথা, হাইকোর্টেও যেতে পারবে না। জজ কোর্টে পৌঁছোবার আগেই নিঃস্ব হয়ে যাবে। থাক এ সব কথা। আপনি যে উদ্যোগ নিয়ে এ সব করে দিলেন তার জন্যে সত্যি আমার ভাল লাগছে। আপনি ডক্টর চাকলাদারকে যদি বলে যান তা হলে ভাল হয়।' দিশা বলল।

'নিশ্চয়ই। কিন্তু মুশকিল হল তোমার প্রেসক্রিপশন দেখে ব্লক হেলথ সেন্টার ওষুধ সার্ভ করতে পারে না। অথচ তোমার এখানে যে পরিমাণ পেশেন্ট এসেছে তাতে ওষুধের জরুরি প্রয়োজন। দেখি, আমি ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলি।' ডক্টর চৌধুরী বললেন, 'দিশা। বুঝতেই পারছো, তোমার বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্ট যে ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে আমার সম্মতি ছিল না। আবার না নিয়েও তো উপায় নেই। তুমি নেহাতই ভিক্টিম অফ সার্কমস্ট্যান্সেস।'

এই সময় শাশুড়ি যশোমতীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এলেন। যশোমতীর হাতে ট্রের ওপর চা এবং কলকাতা থেকে শাশুড়ির নিয়ে আসা কেক প্লেটে সাজানো। শাশুড়িকে দেখেই ডক্টর চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন, 'নমস্কার।'

শাশুড়ি হাত জোড় করলেন। দিশা বলল, 'আপনাদের টেলিফোনেই কথা হয়েছিল। মা ইনি ডক্টর চৌধুরী, আমাদের বস্।'

'না না, ও সব কিছু নয়, আসতে অসুবিধে হয়নি তো?'

'না। বেশ তো এলাম।'

'এই অসময়ে এসে সত্যি বিরক্ত করেছি। নইলে আমার জন্যে এ সব তৈরি হত না।'

'বুঝলাম না!' শাশুড়ি বললেন।

'আমি এই সময় কিছু খাই না।' ডক্টর চৌধুরী বললেন।

'নিয়ম না ভাঙলে তার অস্তিত্ব বোঝা যায় না।' শাশুড়ি বললেন।

দিশা এবার কথা বলল, 'মা, ওঁর ছেলেবেলা কেটেছে শান্তিনিকেতনে। ওর বাবা

ওখানেই ছিলেন।'

শাশুড়ি বললেন, 'জানি!'

ডক্টর চৌধুরী চমকে উঠলেন, 'কীভাবে? কলকাতায় গিয়ে দিশার খবরটা দেওয়ার সময় শুধু নিজের নাম বলেছিলাম, অন্য পরিচয় দিইনি তো!'

'ছেলের মুখে শুনেছি।'

'ও। আপনার ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বটে। কিন্তু সেদিন আপনি টেলিফোনে চেনার কোনও আভাস দেননি।' ডক্টর চৌধুরী বললেন।

'যদি ভুল হয়ে যায়। সামনাসামনি দেখে অবশ্য চিনতে পারলাম।'

'কী আশ্চর্য। কত বছর, প্রায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হবে। আমার চেহারা পালটায়নি? আমি তো পাঁচজনের মধ্যে আপনাকে দেখলে চিনতে পারতাম না।'

'কেউ কেউ একই থেকে যায়। চুলে পাক ধরে অথচ কথা বলার ধরনটা বদলায় না। কিন্তু সেই ছেলেবেলায় আমাকে তুমি ডাকা হত।' শাশুড়ির ঠোঁটের কোণে হাসি।

'হ্যাঁ, মানে, ওই আর কী!' চায়ের কাপ তুললেন ডক্টর চৌধুরী।

দিশা বলল, 'মা, আপনারা কথা বলুন, আমি ভেতরে যাই।'

'হ্যাঁ, তুই স্নান করে নে। তোর ইন্টারভ্যাল শেষ হয়ে আসছে।' শাশুড়ি বললেন।

'আসি স্যার।' দিশা বলতেই ডক্টর চৌধুরী মাথা নাড়লেন।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় কানে এল শাশুড়ির গলা, 'বিয়ে করোনি কেন?'

প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার ধরন, গলার স্বর একেবারে অচেনা মনে হতেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল দিশা ভেতরের ঘরে। তারপরেই দ্রুত পা চালাল। কী উত্তর হবে সে জানে না। তেমন কোনও উত্তর তার না শোনাই ভাল। কিন্তু হঠাৎই তার মনে হল শাশুড়ি শুধু তার সঙ্গে দেখা করতেই আসেননি। এই যে এতগুলো বছর সংসার করেছেন, ছেলেকে মানুষ করেছেন তবু ছেলেবেলার কোনও আবেগের স্মৃতি হয়তো মনের কোণে লুকিয়ে রেখেছিলেন যা কেউ টের পায়নি। আড়ি পেতে তাঁর কথা শোনা অত্যন্ত অন্যায় হবে।

ক্যাম্প বসল। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভিড় বেশি। দিশা প্রত্যেককে বলে দিয়েছিল পরীক্ষা না করালে সে আর রোগী দেখবে না। মাত্র তিনজন ডাক্তার আর প্যাথোলজিস্ট এসেছিলেন ক্যাম্পে। তাঁরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন। দুপুরে দিশা একবার এসে দেখল ডক্টর চাকলাদারও হাত মিলিয়েছেন। ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার তার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গত তিনদিনে আপনি

এতগুলো পেশেন্ট দেখেছেন? এইসব গ্রাম তা হলে তো রোগের ডিপো।'

'হ্যাঁ। এটা আমাদেরই পাপ।'

'কিন্তু রিপোর্ট পেয়ে কী করবেন? হেলথ সেন্টারে তো ওষুধ পাবেন না।'

'ডক্টর চৌধুরী বলেছেন পাঠাবার ব্যবস্থা করতে।'

ডক্টর চাকলাদার বললেন, 'পাঠাবার আগে যেন আপনার সাসপেনশন অর্ডার উইথড্র করে। বাপরে বাপ।'

আজ বিকেলে সুচেতনা বাইরে পা বাড়াল না।

দিশা বলল, 'কী ব্যাপার? ঝিল আজ টানছে না?'

'নাঃ। আজ যাব না।'

'হঠাৎ'?

'এমনি।'

শেষ রোগীকে দেখা হয়ে গেলে শাশুড়ি বললেন, 'চলো, তোমার ঝিল দেখে আসি। সেখানে গিয়ে কবিতা শুনব।'

'না মাসিমা। আজ হাঁটতে ভাল লাগছে না।' সুচেতনা বলল।

'কী হল? নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।

'না না। অন্য কথা বলো না।' সুচেতনা চোখ বন্ধ করল।

'গাছে গাছে ঘুমোট
যেন কালবৈশাখীর প্রতীক্ষা
আমি ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই কি বৃষ্টি নামবে
বাংলার বৃষ্টি?'

বলেই মাথা নাড়ল, 'নাঃ! এটা থাক। অরুণ মিত্রের কবিতার সময় এখন নয়। তার চেয়ে নিজের কথা বলি।' বলে হাসল সে।

শাশুড়ি বললেন, 'বেশ তো শুনি।'

'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে— এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ-বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় তত দূর ভাল মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।'

দিশা বলল, 'তারপর?'

সুচেতনা হাসল, 'দেখেছি হলে হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।'

শাশুড়ি বললেন, 'বাঃ। কী ভাল। সুচেতনা, সত্যি তুমি এক দূরতর দ্বীপ।'

হঠাৎ ঠোঁট মুচড়ে উঠল সুচেতনার। এতক্ষণের সব আলো এক পলকে উধাও। কান্না গিলতে গিলতে বলল, 'সত্যি আমি দূরের, অনেক দূরের। কিন্তু এই নির্জনতা নিয়ে আমি যে মরে যাচ্ছি।'

শাশুড়ি উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এই মেয়ে, কাঁদে না। প্রত্যেকটা মানুষের বুকের মধ্যে নির্জনতা আছে। সেটাই তো সত্যি। মানুষ ছাড়া আর কোনও প্রাণীর নির্জনতাবোধ থাকে না রে।'

দৃশ্যটি দেখে দিশা নিশ্বাস ফেলল।

এই রাত্রে সুচেতনাকে তার আবাসে যেতে দেননি শাশুড়ি। কাছাকাছি বলে যশোমতী গিয়ে খবর দিয়ে এসেছিল। রাত বাড়লে খাওয়া শেষ করে একই খাটে ওরা তিনজন শুয়ে পড়েছিল। দিশা বলেছিল, 'তোমরা গল্প করো, আমার ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন এত কথা বলতে হয়েছে—।'

একটু পরে ওরাও শুয়ে পড়ল। রাত আর একটু বাড়তেই বাইরের দরজায় শব্দটা হল। শাশুড়ি উঠে বসতেই সুচেতনা তড়াক করে উঠল।

শাশুড়ি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'শব্দ হল, না?'

'হুঁ।'

'কেউ এসেছে। ওই তো আবার শব্দ হল। দরজা খোলা ঠিক হবে না।'

'হয়তো কারও খুব অসুখ।' সুচেতনা বলল।

'তাই বলে এত রাত্রে?'

'বাঃ। অসুখ কি সময় বুঝে বাড়ে?'

'বেশ। তবে দিশার উচিত হবে না যাওয়া।'

'ওকে ডেকে বলি, ওই ঠিক করুক।'

দিশাকে ডাকা হল। শুনে সে বলল, 'এ রকম তো হয় না। দাঁড়াও, গিয়ে দেখি কী ব্যাপার?'

'কিন্তু বাজে লোক যদি হয়?' শাশুড়ির মনে দ্বিধা।

'আমরা চারজন আছি, বাজে লোকে কী করতে পারে।' দিশা খাট থেকে নেমে

দেখল চতুর্থজন আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খোলার আগে দিশা জিজ্ঞাসা করল 'কে?'

'আমরা।'

'পরিচয় দিন।'

'পরিচয় দিলে চিনতে পারবেন না। দয়া করে দরজা খুলুন।'

দিশা পেছনের দিকে তাকাল। ভেতরের দরজায় শাশুড়ি উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে। তার পাশে দাঁড়িয়ে সুচেতনা মুখ নিচু করে আছে। সে বলল, 'দেখুন, এত রাত্রে—।'

দরজার ওপাশ থেকে চাপা স্বরে কথা ভেসে এল, 'অন্যসময়ে আমাদের পক্ষে এখানে আসা সম্ভব নয় দিদি। প্লিজ, ভুল বুঝবেন না।'

এরপরে আর ইতস্তত করল না দিশা। দরজা খুলে দেওয়ামাত্র তিনজন ছেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। ওদের একজন দরজা ভেজিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই এটা ভদ্র ব্যবহার নয় কিন্তু কী করব বলুন, আমাদের অন্য উপায় নেই। একটু জল খাওয়াবেন?'

দিশা পেছন দিকে তাকানো মাত্র সুচেতনা ভেতরে ছুটে গেল।

দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কারা?'

'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?' একজন প্রশ্ন করল।

মাথা নেড়ে না বলল দিশা।

'খুব স্বাভাবিক। তখন আপনি টেনশনে ছিলেন। আমার জন্যেই আপনি আজ এ বাড়িতে।' ছেলেটি খুব সরল গলায় বলল।

'ঠিকানা ভারতবর্ষ?'

'অবশ্যই।'

'ওঃ। আপনারা আমার কাছে এসেছেন কেন? অনেক হয়েছে, পুলিশ আমার সম্পর্কে তদন্ত করছে, আপনারা আমার বিপদ আর বাড়িয়ে দেবেন না!'

'না। আপনি কোনও বিপদে পড়বেন না। আমরা এসেছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে।'

'প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম বলে?'

'হ্যাঁ। তবে আমার নয়। এই এলাকার হাজার হাজার অবহেলিত মা-বোনেরা যদি আপনাকে ঘিরে সুস্থতার স্বপ্ন দ্যাখে তা হলে আমাদের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে।'

এইসময় সুচেতনা তিন গ্লাস জল ট্রে-তে নিয়ে এল। তাকে বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ওরা জল খেল।

দিশা বলল, 'দেখুন আপনাদের কাজ সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমি এখানকার মানুষদের একটু সাহায্য করার চেষ্টা করছি মাত্র। কিন্তু অস্ত্র ছাড়া যে লড়াই

আমারবই.কম

করা যায় না এটা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি।'

'জানি। আমরা ওই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি।'

'মানে?' অবাক হল দিশা।

'মাইনর অপারেশন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের জন্যে যা যা দরকার তার দাম কী রকম হবে? আপনি যদি একটা লিস্ট করে দেন তা হলে আমরা জোগাড় করার চেষ্টা করতে পারি।' এবার দ্বিতীয়জন কথা বলল।

'আপনাদের ধারণা নেই। প্রচুর টাকা এর জন্যে প্রয়োজন।'

'অনুমান করছি। খোলাখুলি বলি আমরা আগামী তিনদিনের মধ্যে পঁচিশ লক্ষ টাকা পাচ্ছি। তা থেকে দশ লাখ টাকা এই বাবদ বরাদ্দ হয়েছে।' ছেলেটি বলল।

'দশ লাখ! এত টাকা আপনারা কোথায় পেলেন?'

'খোলাখুলি বলি। এদেশের কিছু মানুষ সরকারি যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে কালো পথে টাকার পাহাড় তৈরি করছে। এই বুর্জোয়া সরকার গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদের মদত দিয়ে চলেছে। ফলে গরিব মানুষ আরও গরিব হচ্ছে। আমরা ওই ধরনের মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিঃস্বদের বাঁচাতে চাই।'

'আপনারা চাইলেই তারা টাকা দিয়ে দেবে?' দিশা হাসল।

'না। তাই বাঁকা পথ নিতে হচ্ছে। ওদের একজনকে আমরা ধরে নিয়ে এসেছি। প্রাণের ভয়ে সে আত্মীয়দের লিখেছে পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে দিতে।'

'তার মানে আপনারা কিডন্যাপ করে টাকা আদায় করছেন?'

'এছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।'

'অসম্ভব। এ অন্যায়। অত্যন্ত অন্যায়।' দিশা চিৎকার করল। 'এই টাকায় কেনা কোনও ওষুধ আমি ব্যবহার করতে পারব না। আপনারা এখন যেতে পারেন।'

তিনজনেই ওর কথা বলার ধরনে হকচকিয়ে গেল। সুচেতনা এবার কথা বলল, 'কিন্তু একে অন্যায় বলছ কেন? লোকটা টাকা জমিয়েছে অন্যায় পথে, তাকে মানুষের উপকারে খরচ করাটা তো অত্যন্ত ন্যায়কাজ।'

'না সুচেতনা। আমি একমত নেই। এই টাকা কোথায় পেলাম তা আমি কাউকে বলতে পারব না। অপরাধ সব সময় ধাওয়া করবে আমাকে। যদি পুলিশ আসে, ইনকামট্যাক্স আসে তা হলে কী জবাব দেব তাদের? এই টাকা খরচ করাও একই অপরাধের মধ্যে পড়ে। সরি।'

'আপনি একসঙ্গে সব টাকার ওষুধ না কিনে প্রয়োজনমতো কিনতে পারেন।'

'না। আমি তো বলেই দিলাম। এবার আপনার যেতে পারেন।'

প্রথম ছেলেটি বলল, 'আপনি একটু সাহসী হলে ভাল হত। আপনার কাছে আমি

কৃতজ্ঞ দিদি। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। সেদিন তো কিছু না করে পরে পুলিশের কাছে আমাকে তুলে দিতে পারতেন। যে মহিলাকে আপনি শহরে নিয়ে গিয়ে সন্তানমুক্ত করে এনে নতুন জীবন দিয়েছেন সেটাও তো না করতে পারতেন। এ ক্ষেত্রেও আর একটু ভাবুন। আপনার মানবিকতার কাছে আমরা আবেদন রাখছি। আচ্ছা চলি।'

দরজা খুলে রাতের অন্ধকারে ওরা মিলিয়ে গেল নিঃশব্দে।

শাশুড়ি এগিয়ে এলেন, 'এরা কারা?'

'জানি না। জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, ওদের ঠিকানা ভারতবর্ষ।'

'মানে?'

'যা মনে হয় তা ভেবে নাও।'

'এরা কি উগ্রপন্থী?'

'মাথা নিচু করে যারা মেনে না নেয় তাদের উগ্রপন্থী বলে।' দিশা বলল, 'চলো, শুয়ে পড়বে। এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই।'

সুচেতনা বলল, "দিশা, তবু তুমি ভাবো। কত মানুষের উপকার হত বলো তো।'

দিশা ওর দিকে তাকাল, তাকিয়ে থাকল।

সুচেতনা অস্বস্তিতে পড়ল, 'কী হল?'

দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি জানো কতটা বিপদের মধ্যে পা বাড়িয়েছো?'

সুচেতনা চট করে শাশুড়ির দিকে তাকাল। তারপর দিশার চোখে চোখ রেখে বলল, 'জানি। আমার তো কোনও পিছুটান নেই। তোমার আছে।'

'মানে?'

'আমি বিবাহিত নই দিশা। যাকে ভালবেসেছি তার সঙ্গে জীবন জড়িয়েছি।'

অন্ধকার ঘরে বিছানার একপ্রান্তে শুয়ে দিশা সুচেতনার কথাটাই মনে মনে নাড়াচাড়া করছিল। পিছুটান। তার পিছুটান কি সূর্য? কিন্তু সূর্য তো তাকে পিছনে টানছে না। ডক্টর চৌধুরীর কাছে খবর পেয়েও একটা চিঠি লেখেনি। মায়ের হাত দিয়েও পাঠাতে পারত। তার চিঠির জবাব আসার সময় হয়নি অবশ্য।

পিছুটান নয়, সে কি আজ দশ লক্ষ টাকা শুনে ভয় পেল? গ্রেপ্তার হওয়ায় ভয়, জেলে যাওয়ার ভয়! অথচ নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে সকাল থেকে সন্ধে পেশেন্ট দেখার পরিশ্রমের বিনিময়ে একটি পয়সা রোজগার না করেও তো সে আনন্দ পাচ্ছে। যে যে ওষুধের অভাব প্রতিনিয়ত সে বোধ করছে তা ওই টাকা পেলে দূর হত। দিশার মনে হল নিরস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধ করার সময় যে অস্ত্র তাকে দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে তাতে অন্যায়ের ছাপ থাকায় সে মেনে নিতে পারছে না। কী করা যায়!

আমারবইপাড়া

দু'দিন খুব ব্যস্ততায় কাটল। একের পর এক পেশেন্ট দেখে যেতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে এটা ঠিক নয়। একজন ডাক্তারের গল্প শুনেছিল সে। ভদ্রলোক চেম্বারের বাইরে এসে অপেক্ষায় থাকা পেশেন্টের অসুবিধে জিজ্ঞাসা করেই ইঞ্জেকশন দিতেন, সেই রোগীকে ইঞ্জেকশন দিতে দিতে দ্বিতীয়জনের অসুবিধা কী জানতে চাইতেন। তাঁর ভিজিট ছিল ইঞ্জেকশন সমেত দশটাকা। দেখা যেত বেশিরভাগ মানুষ ওই একটা ইঞ্জেকশন নিয়েই সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিত কিন্তু তাদের কিছু অংশ দিন পনেরো পর আবার অসুস্থ হয়ে ফিরে আসত। ভদ্রলোক বলতেন মাসে কুড়িটাকা খরচ করে ওরা মাসের মজুরিটা কারখানা থেকে ঠিকঠাক পায়। ট্যাবলেট দিয়ে বাড়িতে শুইয়ে রাখলে খাবে কী!

তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে বিপরীত। সাধারণ ওষুধ গৌরাঙ্গবাবু দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই যে ক্যাম্প থেকে ইউরিন পরীক্ষা করে বলেছে ইউরিন কালচার করতে হবে কারণ বিকোলাই-এর সম্ভাবনা প্রবল, সেটা সে এখানে কী ভাবে করাবে। সম্ভাবনা আছে বলে সে আগাম ওষুধ খেতে বলতে পারে না আর সেই ওষুধ হেলথ সেন্টারে পাওয়া যাবে না। তবে গৌরাঙ্গবাবু জানিয়েছেন আজই কিছু নতুন স্টক এসেছে যার মধ্যে ম্যালেরিয়ার ওষুধ রয়েছে। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে যাদের জ্বর শুরু হয়েছিল তাদের ভাগ্য খুব ভাল।

শাশুড়ি এবার ফিরে যেতে চাইছেন। আর কয়েকটা দিন থাকার কথা বলতে মাথা নেড়ে বললেন, 'না রে। অনেকদিন তো হয়ে গেল, ওরা দু'জন কী করছে কে জানে!'

'তুমি তো কোথাও গেলে না!'

'কোথায় আর যাব। তোর এখানে যা অবস্থা, তুই তো পাগল হয়ে যাবি!'

'হ্যাঁ। ভাবছি এবার একটু একটু করে কমাব। যাকগে, অন্তত শহরটা দেখে যাও।'

'শহর?'

'হ্যাঁ। বাসে বেশি সময় লাগবে না!'

একটু ভাবলেন শাশুড়ি। তারপর বললেন, 'না, থাক।'

দিশা জোর করল না। কিন্তু পরের দিন সকালে সে অবাক। সূর্য এসেছে!

ওকে দেখে কী রকম ছেলেমানুষি আনন্দে মেতে উঠল দিশা, 'তুমি? হঠাৎ?'

'মাকে নিতে এলাম। বাবা অস্থির হয়েছেন।'

শাশুড়ি বললেন, 'ঢং।'

'এই বাড়ি চিনলে কী করে?'

'তুমি তো এখানে ভি আই পি। বাস থেকে নেমেই শুনলাম তিনজন মেয়ে বাচ্চা

তোমার কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে। তাদের অনুসরণ করে চলে এলাম।' সূর্য হাসল।

'তুমি ভেতরে যাও, রেস্ট নাও।'

'তোমার কাজ কখন শুরু হবে?'

শাশুড়ি বললেন, 'পারলে ওরা ওকে ঘুম থেকে তুলে ফেলে। দ্যাখনা, এর মধ্যে দশজন হাজির হয়ে গিয়েছে।'

দিশা বলল, 'আমি বলে দিচ্ছি আজ দুপুরের পর দেখব না।'

'দ্যাখো।'

আজ কোনও জটিল অসুখ নিয়ে কেউ আসেনি। যে সব মানুষ এসেছে তাদের অসুস্থতার চিকিৎসা করার মতো ওষুধ হেলথ সেন্টারে আছে। তাই কাগজের ওপর জি লিখে স্বস্তি পেল দিশা। তার মনে হল সূর্য এসেছে বলেই ঈশ্বর প্রসন্ন হয়েছেন।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর সূর্য জানাল কাল সকালেই সে ফিরে যাবে।

দিশা বলল, 'কাল কেন? একদিন থাকবে না?'

সূর্য না বলতে যাচ্ছিল কিন্তু শাশুড়ি বাধা দিলেন, 'ঠিকই তো, পরশু যাব আমরা।'

সূর্য বলল, 'আমার পেশেন্টরা খেপে যাবে।'

শাশুড়ি বললেন, 'যাক। আচ্ছা, তুই কী রকম স্বামী? তোর বউ এত বড় একটা সমস্যায় রয়েছে অথচ তুই কোনও সাহায্য করা দূরে থাক— খোঁজখবর করছিস না।

'মা, দিশা জানে কীভাবে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়।'

'না। আমি মোটেই জানি না। যেদিন আমাকে সাসপেন্ড করা হল সেদিন যদি অনুমতি পেতাম সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় চলে যেতাম।' দিশা বলল।

'না, দিশা, তোমাকে এখানকার মানুষ ছাড়ত না।'

'কাউকে কি কেউ জোর করে ধরে রাখতে পারে? শুধু পুলিশের পক্ষেই সেটা সম্ভব। পুলিশ আমাকে এলাকার বাইরে যেতে নিষেধ করেছে বলেই তো।'

'শোনো, সত্যি তুমি কলকাতায় যেতে চাও?' সূর্য জিজ্ঞাসা করল।

'কী ভাবে?' দিশা তাকাল।

'আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি। তোমাকে শহরে গিয়ে একজন ভাল উকিল ধরে কোর্টে অ্যাপিল করতে হবে। তুমি একজন সরকারি ডাক্তার, বিবাহিত। তোমাকে কলকাতায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। পুলিশের প্রয়োজন হলেই তুমি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। এই আবেদনের ওপর ভিত্তি করে কোর্ট তোমাকে অনুমতি দিতে পারেন।' সূর্য বলল।

'ঠিক আছে, তাই করব।' দিশা বলল।

শাশুড়ি বললেন, 'দেরি করে কী লাভ? এখনও সময় আছে, তোরা শহরে চলে যা। উকিলের সঙ্গে কথা বলে সন্ধের মুখে ফিরে আসতে পারবি।'

সূর্য বলল, 'মা, সারারাত বাসে জেগে কাটিয়েছি। আজ থাক। কাল সকালে যাব। তুমি কি এখানকার কোনও উকিলকে চেনো?'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে না বলল দিশা।

সূর্য একটু ভাবল, 'আমরা এক কাজ করতে পারি। ডক্টর চৌধুরীর সাহায্য নিতে পারি। উনি এত বড় পজিশনে আছেন, উনি কাউকে সাজেস্ট করতে পারবেন।'

শাশুড়ি মাথা নাড়লেন, 'না না। ওর কাছে যাওয়ার দরকার নেই।'

সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'কেন'?

'উনি তো দিশার সাসপেন্ডের ব্যাপারে কিছু করতে পারেননি। হয়তো চাননি বলেই করেননি। ওঁকে এ সব বলা মানে হয়তো বিব্রত করা।' শাশুড়ি বললেন।

দিশা চট করে শাশুড়ির দিকে তাকাল। তিনি উঠে গেলেন।

বিকেলে অনেকদিন পরে বের হল দিশা। শাশুড়িই সূর্যর সঙ্গে তাকে ঠেলে বের করলেন। নির্জন হাইওয়ের পাশ দিয়ে অনেকটা হেঁটে এল ওরা। দিশা অনেকক্ষণ ধরে যে কথাটা বলতে চাইছিল শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল, 'এই, আমার ওপর রাগ করেছ?'

'কী মনে হয়?' সূর্য তাকাল না।

'রেগে যাওয়া স্বাভাবিক।'

'তো?'

'আমি কী করব বুঝতে পারছি না।'

'তোমার একদিকে আমি আর একদিকে গরিব অসুস্থ মেয়ে বউ বাচ্চা। তুমি ওদের বেছে নিয়েছো। যে কোনও মানুষ তোমাকে হাততালি দিয়ে সম্মান জানাবে।'

'বিশ্বাস করো। আমি কিছু করিনি, এরাই আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।'

'বেঁচে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ।' সূর্য হাসল।

দিশা বলল, 'মানে?'

'যে বাঁধা জড়িয়ে আছে তাকে ছাড়াতে চাও কিন্তু ছাড়াতে গেলে ব্যথা লাগছে। কী করবে বলো! এটাই স্বাভাবিক, আমার নিয়তি।'

'অমন করে বলছ কেন? আমি তো কাল সকালে তোমার সঙ্গে শহরে গিয়ে

উকিলের সঙ্গে কথা বলছি।' দিশা জোর গলায় বলল।

সূর্য ঘুরে দাঁড়াল, 'দিশা, তুমি আমাকে কতখানি ভালবাসো?'

মুখ তুলল দিশা, 'তুমি জানো না?'

'না।'

'ওঃ।'

'তা হলে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাও।'

'ধ্যেৎ।'

'এখানে কোনও জনমানুষ নেই। দু'পাশে শুধু গাছ আর গাছ। দূরে কোনও গাড়িও দেখা যাচ্ছে না।'

'ঠিক। কিন্তু পাখিরা আছে।'

'মানে?'

'যেটা আমার ব্যক্তিগত আনন্দ সেটা আমি পাখিদেরও দেখাতে চাই না।'

হেসে ফেলল সূর্য। হাসতে হাসতে বলল, 'চলো, সন্ধে হয়ে আসছে।'

বাড়ি ফিরে এসে ওরা অবাক। বাইরের ঘরটায় পা রাখার জায়গা নেই। ছোট বড় পিচবোর্ডের বাক্স দেওয়াল আড়াল করে রেখেছে। তারই ফাঁক গলে শাশুড়ি এসে দরজা খুলেছিলেন। বললেন, 'তোরা বেরিয়ে যাওয়ার পরেই একটা লোক এসেছিল। বলল সই করে দিতে। তোর নাকি অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। আমি সই করতেই এগুলো নামিয়ে রেখে চলে গেল। রাখার জায়গা নেই বলে এইভাবে রেখে দিয়েছে।'

'কী এগুলো?' দিশা জিজ্ঞাসা করল।

সূর্য ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। বাক্সর ওপরে লেখা দেখে বলল, 'ওরে বাব্বা। তুমি এইসব ওষুধের অর্ডার দিয়েছ? দামি দামি ওষুধ সব। একটায় অপারেশনের যন্ত্রপাতিও আছে। অনেক টাকার ব্যাপার। এত টাকা কোথায় পেলে?'

মুখ শক্ত হয়ে গিয়েছিল দিশার। সে বলল, 'আমি কোনও অর্ডার দিইনি।'

'যাঃ। না দিলে বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ একসঙ্গে তোমার কাছে আসবে কেন? এ তো স্যাম্পেলও নয়। রীতিমতো একটা নার্সিংহোম চালানো যায়।' সূর্য বলল।

শাশুড়ি একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। দিশা দেখল তাতে কোন বাক্সে কী কী ওষুধ রয়েছে তার তালিকা। সে অবাক হয়ে গেল। এই তালিকার অনেক ওষুধ সে তার দপ্তরের কাছে আবেদনে চেয়ে পাঠিয়েছিল যা ডক্টর চৌধুরী বলেছিলেন দেওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ শাশুড়ি বললেন, 'ওরা নয় তো?'

সূর্য জিজ্ঞাসা করল, 'কারা?'

'কিছুদিন আগে এক রাত্রে হঠাৎ তিনজন ছেলে এসেছিল। তারা আমাকে দশ

লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিল ওষুধপত্র কেনার জন্যে। কিন্তু টাকাটা তারা একজন বড়লোককে কিডন্যাপ করে আদায় করবে বলায় আমি রাজি হইনি।'

'এরা কারা?'

'জানি না। কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, ঠিকানা ভারতবর্ষ।'

'ওরাই কি এ সব পাঠিয়েছে?'

'জানি না। তবে মনে হয় তাই। কার গরজ পড়বে এত টাকার ওষুধ গরিব মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে!'

'তা হলে?'

'আমি বুঝতে পারছি না এগুলো নিয়ে কী করব?'

সূর্য একটু ভাবল তারপর বলল, 'তুমি এগুলো ফেলে দিতে পারো না। যাদের জন্যে ওষুধগুলো এসেছে তাদের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছে দিলে ওরা বেঁচে যাবে। তুমি তো চাওনি, কিন্তু যেচে যে এল তাকে ফেলে দিতে তুমি পারো না।'

'কিন্তু কোথায় কী করে এ সব পেলাম তার জবাবদিহি কী ভাবে দেব?'

'বলবে গিফট। কেউ দান করেছে। দেখি কাগজটা।' হাত বাড়াল সে।

দিশা লিস্টটা দিল। ওটা দেখে হাসল সূর্য, 'প্লেইন কাগজে টাইপ করা হয়েছে। কোনও ঠিকানা নেই। তুমি আর একটা কাজ করতে পারো।'

দিশা তাকাল।

'সোজা থানায় গিয়ে ঘটনাটা জানাও।'

'না!'

'কেন?'

'তা হলে ওরা যে রাত্রে এসে দশ লাখ টাকার প্রপোজাল দিয়েছিল সেটা বলতে হয়। আমি টাকাটা নিতে চাইনি কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য তো সৎ ছিল।'

'সৎ থাকলে নিলে না কেন?'

'কারণ আমি রবিনহুডকে সমর্থন করি না।'

'তা হলে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ভেবে নাও রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছ।'

অনেক রাত পর্যন্ত ওরা কাজ করল। বাক্স খুলে ওষুধগুলো সাজিয়ে রাখল ঠিকঠাক। যে বাক্সে ছুরি কাঁচি ফরসেপ ইত্যাদি রয়েছে সেগুলো আলাদা করল। সূর্য বলল, 'ওরা কোত্থেকে নামগুলো পেল জানি না কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের পরিমাণ বেশি। এই যে এটা দেখছ, এর একটা ক্যাপসুলের দাম সত্তর টাকা করে।'

'এখানকার মানুষের স্বপ্নেরও বাইরে।' দিশা বলল।

'সুতরাং তুমি এখন নিধিরাম সর্দার নও।'

'যদি এ সব ওষুধ হেলথ সেন্টারে আসত তা হলে তাই মনে হত।'

'এখন মনে হচ্ছে না?'

'ঠিক পুরোপুরি নয়।'

পরের দিন সকাল থেকেই ভিড়। কীভাবে রটে গেছে ডাক্তারদিদির কাছে গেলে ওষুধ পাওয়া যাবে। প্রত্যাশা বেড়ে গেল মানুষের। দিশা বলল, 'কী হবে?'

সূর্য হাসল, 'কী আর হবে! তোমাকে কর্তব্য করতে হবে!'

'কিন্তু আজ আমাদের শহরে যাওয়ার কথা ছিল।' দিশার গলায় অস্থিরতা।

'কাল যাব।'

'তুমি কাল থাকবে?' চিৎকার করে উঠেছিল দিশা।

শাশুড়ি বললেন, 'থাকবে যখন বলছে তখন আর এ নিয়ে ভাবিস না।'

আজ একটু অভিনব ব্যাপার হল। সূর্যই ব্যাপারটা সাজাল। ঘরের মাঝখানে ওষুধের খালি বাক্সগুলো সাজিয়ে দেওয়াল করা হল। একপাশে দিশা পেশেন্ট দেখবে। তাদের যদি সেইসব ওষুধের দরকার হয় যা অযাচিতভাবে এসেছে তা সূর্য বাক্সের দেওয়ালের এপাশে বসে খুঁজে নিয়ে দিয়ে দেবে। স্থানীয় ছেলেদের দিশা বলে দিল, ইতিমধ্যে যাদের রক্ত বা ইউরিন ক্যাম্পে পরীক্ষা করা হয়ে গেছে তারা যেন সেই রিপোর্ট নিয়ে আজই তার সঙ্গে দেখা করে।

দুপুরে খাওয়ার জন্যে আধঘণ্টা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল দিশা। সূর্য বলল, 'আমার যে এর মধ্যেই কমপাউন্ডার হিসেবে নেশা ধরে গেছে।'

'চলে এসো এখানে।'

'আসতে পারি। খাব কী?'

'সেটা ঠিক হয়ে যাবে।' দিশা বলেছিল।

বিকেলে সবাই চলে যাওয়ার পর গৌরাঙ্গ এল, 'করেছেন কী ম্যাডাম!'

'কেন?'

'শুনলাম দামি দামি ওষুধ আপনি নিজেই দিচ্ছেন।'

'হঠাৎ পেয়ে গেলাম এগুলো।' বাক্সগুলো দেখাল দিশা।

'কোত্থেকে এল? এত ওষুধ!'

'কেউ একজন দান করেছেন। যিনি দান করেছেন তিনি নাম জানাতে চাননি।'

'তা হলে একটু ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে ম্যাডাম।'

'কী রকম?'

'ওষুধগুলো তো জাল হতে পারে।'

সূর্য চুপচাপ শুনছিল, বলল, 'না। এগুলো যে জাল নয় তা আমি হলফ করে

আমারবই.কম

বলতে পারি।

'ব্যাচ নাম্বার, ডেট, কোম্পানির নাম, সব আছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে ভাল। ও হ্যাঁ, একটা খবর আছে।' গৌরাঙ্গ বলল।

'কী খবর?' দিশা তাকাল।

'ডক্টর চাকলাদার আজ অনেকদিন বাদে শহরে গিয়েছিলেন। একটু আগে ফিরেছেন, ওঁর কাছে শুনলাম ডক্টর চৌধুরী আগামীকাল এখানে আসছেন।' গৌরাঙ্গ বলল।

'উনি তো প্রায়ই আসেন।'

'আগে আসতেন না। তা এবার আসছেন অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে।'

'কী ব্যাপার?'

'ডিপার্টমেন্ট ওঁকে আপনার ব্যাপারে রিপোর্ট দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছে।'

'তাই নাকি!' খুশি হল দিশা।

এই সময় একজন মহিলা অত্যন্ত সংকুচিত ভঙ্গিতে বারান্দায় উঠে আসতে গৌরাঙ্গ তাকে বলল, 'কিছু করার নেই। এই দিদিও কিছু করতে পারবে না। আপনার মেয়েকে এখনই শহরে নিয়ে যান। নইলে বাঁচাতে পারবেন না।'

দিশা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

'বাচ্চা হবে। পেইন উঠেছে অথচ ডেলিভারি হচ্ছে না। আমাকে তো দেখতে দেবে না তাই ধাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলল বাচ্চা বের হওয়ার রাস্তা নাকি ছোট। বুঝতেই পারছেন। আরে, আপনি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। যান। আচ্ছা চলুন, আপনার বাড়ির ছেলেদের আমি বুঝিয়ে বলছি।' গৌরাঙ্গ মহিলাকে নিয়ে চলে গেল।

দিশা সূর্যর দিকে তাকাল, 'কিছু বুঝলে?'

'সিজার কেস?'

'হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আমি কি যাব দেখতে?'

শাশুড়ি বললেন, 'পাগল। তোকে তো ওরা কল্ দেয়নি। যেচে গিয়ে কিছু হলে বিপদে পড়ে যাবি। একেই পুলিশ তোর পেছনে লেগেছে।'

দিশা মাথা নাড়ল, 'এখনও বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে শিশু-মৃত্যু বা জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের মৃত্যু কেন হয় তা বুঝতে পারছি।'

আজ ওরা বের হল না। সন্ধে নামলে ওরা তিনজনে বাড়ির সামনের মাঠে বসে গল্প করছিল। শাশুড়ি বললেন, 'দ্যাখ আকাশে কত তারা। এত তারা আমরা

কলকাতায় দেখতে পাই না।'

ওরা আকাশ দেখল। সূর্য বলল, 'জায়গাটাও খারাপ নয়। খুব নিরিবিলি।'

দিশার মনে পড়ল, 'মা, আজ সারাদিন সুচেতনা আসেনি, না?'

'কালও তো আসেনি।' শাশুড়ি বললেন, 'শরীর খারাপ হয়েছে কিনা দ্যাখ।'

'চলো, ঘুরে আসি।' দিশা সূর্যর দিকে তাকাল।

'দূর। সারাদিন এত পরিশ্রমের পর তোমার এনার্জির দেখছি কমতি নেই।'

শাশুড়ি বললেন, 'দাঁড়াও, যশোমতীকে নিয়ে আমিই ঘুরে আসছি।'

তিনি উঠে গেলেন। যশোমতী যেন এ রকম প্রস্তাবের জন্যে মুখিয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল। সূর্য ওদের যাওয়া দেখল। তারপর বলল, 'তোমাকে খুব মিস্ করছি দিশা।'

দিশা চমকে একবার তাকিয়ে মুখ নামাল।

একটু বাদে সে বলল, 'আর ক'টা দিন অপেক্ষা করো, প্লিজ।'

'তারপর?'

'আমি কোনও অন্যায় করিনি। নিশ্চয়ই ওরা আমাকে মুক্তি দেবেন।'

'তারপর'?

'আমি তোমার কাছে চলে যাব।'

'কিংবা এমনও তো হতে পারে, আমি এখানে চলে এলাম।'

'মানে?'

'মুক্তি পাওয়ার পর তুমি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিলে। আমরা দু'জন এখানে একটা এসটাব্লিশমেন্ট করলাম। তুমি মেয়েদের আর আমি ছেলেদের দিকটা দেখব।'

'খুব ভাল হয় তা হলে!' উত্তেজিত হল দিশা।

'ধরো, আমরা মাত্র পাঁচটাকা করে দক্ষিণা নিলাম। মাত্র পাঁচটাকা।'

'জানো। পাঁচ টাকাও ওদের পক্ষে বেশি হয়ে যাবে। দু'টাকা করো।'

'দু'টাকা! পঞ্চাশজন পেশেন্ট দেখলে একশো টাকা। কী করে চলবে! খাবে কী আর ঘর ভাড়াই বা কী দেবে? অসম্ভব।'

সূর্য যখন কথাগুলো বলছে তখন পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে গেছে। হঠাৎ দিশার মনে হল কেউ যেন হুড়মুড়িয়ে তার বারান্দায় উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। সে চিৎকার করল। 'কে?'

ওরা ছুটে এসে শুনল, 'আমি।' সুচেতনার গলা।

'সুচেতনা? একী! তোমার কী হয়েছে?' দিশা নার্ভাস।

সূর্য বলল, 'আগে ওকে ধরো, ভেতরে নিয়ে চলো।'

ঘরের ভেতরে আলোয় নিয়ে যেতেই চমকে উঠল দিশা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেয়েটার রোগা শরীর। হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে।

দিশা সূর্যকে বলল, 'দ্যাখো তো কোথাও উল্ড হয়েছে কিনা।'

সুচেতনা মাথা নাড়ল, 'আমার না, আমার না। তুমি যাও, তুমি ওকে বাঁচাও।'

'কী হয়েছে? কার কী হয়েছে?' দিশা উত্তেজিত হল।

'ওর। তোমার কাছে এসেছিল।' বড় বড় করে নিশ্বাস নিচ্ছিল সুচেতনা। তার চোখ বড় হয়ে যাচ্ছিল! দিশা চিৎকার করল, 'তোমার ইনহেলার কোথায়?'

'ঝিলের ধারে, পুলিশ, পুলিশ, গুলি করেছে। আঃ, আঃ।'

সুচেতনার ছোট্ট বুকে প্রবল আন্দোলন। কথা বলতে পারছে না সে। দিশা সূর্যকে বলল, 'ও অ্যাকুট্ অ্যাজমা পেশেন্ট। কী করা যায়?'

'এখনই অক্সিজেন দেওয়া দরকার। হেলথ সেন্টারে পাওয়া যাবে?'

'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আচ্ছা, ওই বাক্সটায় কী ছিল?'

সূর্যর মনে পড়ল। দুটো বাক্স পুরো খোলা হয়নি কারণ তার ভেতরে কোনও ওষুধ ছিল না। সে দ্রুত এগিয়ে গেল। বাক্স খুলে যে যন্ত্রটি বের করল সেটি দৈর্ঘ্যে ফুট খানেক। সূর্য বলল, 'ফরসেপ।' তারপর দ্বিতীয় বাক্সটি খুলল, 'না, অক্সিজেন নেই।'

'অদ্ভুত। এত জিনিস দিতে পারল আর অক্সিজেনের কথা মনে পড়ল না।'

দিশার গলায় এমন একটা জ্বালা ছিল যে সূর্য হেসে ফেলল। অন্যায়ের ছাপ আছে বলে যাকে সে নিতে চায়নি তার কাছেই এখন কী আশা।

এদিকে সুচেতনার শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। তবু তার মধ্যেই সে বিড়বিড় করছে, 'ওকে বাঁচাও। ওর গুলি লেগেছে।'

দিশা উঠল। ঝিলের ধারে পুলিশ গুলি করেছে। এমন হতে পারে সুচেতনার ইনহেলার ওর বাড়িতেই পড়ে আছে। সে কোনও কথা না বলে ছুটল। দোকানটার কাছে আসতেই একটা ভিড় দেখতে পেল। দোকানদারও দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। তাকে দেখে বলল, 'শুনেছেন?'

'কী?'

'ঝিলের ধারে যুদ্ধ হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পুলিশের।'

'ও।'

'আমি দোকান বন্ধ করে দিচ্ছি। যদি কেউ পালিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে তার খোঁজে পুলিশ এদিকে আসবে। তার মানেই ঝামেলা।'

দিশা দাঁড়াল না।

গম্ভীর চেহারার ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন, 'কী চাই?'

'সুচেতনার ইনহেলারটা পেতে পারি কি? আমি ডাক্তার।'

'ওর জিনিস দেওয়ার অধিকার তো আমার নেই।' ভদ্রমহিলার ঠোঁট নড়ল।

'আমি ওর জন্যেই চাইছি।'

'ওর টেবিলে দেখুন।'

টেবিলের ওপরই পড়ে আছে ইনহেলার। প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ছুটল দিশা।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছে ততক্ষণে, সুচেতনার মুখ বীভৎস। স্প্রে করতে লাগল দিশা। কিছুক্ষণ পরে চোখ স্থির হল। জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। যেটুকু দেওয়ার তার থেকে বেশি দেওয়া হয়ে গেল উত্তেজনায়।

এইসময় শাশুড়ি ফিরে এলেন। বাইরে থেকেই বললেন, 'মেয়েটা ওর ঘরে নেই যে।'

তারপর দরজায় এসে চিৎকার করে উঠলেন, 'এ কী!'

সূর্য তাঁকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলল।

'এখন কী করবি? পুলিশ জানতে পারলে—।' শাশুড়ি উদ্বিগ্ন।

'জানতে পারলে জানবে। এই অবস্থায় ওকে আমরা বাইরে ফেলে দিতে পারি না।' দিশা বলল। ততক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়েছে সুচেতনা। ধাক্কা সামলে নেতিয়ে পড়েছে। ওকে শুইয়ে দিল দিশা।

আধঘণ্টা পরে সমস্ত এলাকা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে গেল। সূর্য বলল, 'ওরা কি সুচেতনার জন্যে আসবে?'

'যদি জানতে পারে তা হলে—। শোনো, আমি যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'পুলিশের কাছে।'

'কেন?'

'ওরা সুচেতনার বাড়িতে গেলেই ওর রুমমেট আমার কথা বলবেন। তা হলেই পুলিশ এখানে চলে আসবে। সুচেতনাকে লুকিয়ে রাখবার কোনও পথ নেই। তা ছাড়া মেয়েটাকে আমার সন্দেহ হত কিন্তু ও যে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে জড়িত তা আমি জানতাম না।' দিশা বলল।

'উগ্রপন্থী বলতে তুমি কী বোঝ?' সূর্য তাকাল।

দিশা বলল, 'সূর্য, এখন তাত্ত্বিক আলোচনা করার সময় নয়।'

শাশুড়ি বললেন, 'ওকে এখানে পেলে পুলিশ কি তোদের ছেড়ে দেবে?'

'না দেবে না। থানার দারোগাকে আমি চিনি।'

'বেশ, যা ভাল বোঝো তাই করো।' সূর্য বলল।

দিশা বেরিয়ে এল। এখন সব অন্ধকার। আশেপাশের বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দু'দুটো ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে বড় রাস্তায়। দিশা দেখল সূর্য তার পাশে চলে এসেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এলে কেন?'

'যেহেতু সেখানে একা যেতে দিতে পারি না।' সূর্য বলল।

দোকানদার দোকান বন্ধ করার সুযোগ পায়নি। পুলিশ তাকে জেরা করছিল। যে ভিড়টাকে দিশা এখানে দেখে গিয়েছিল সেটা এখন উধাও।

দারোগাকে দেখতে পেল দিশা। ক্ষিপ্ত গলায় দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি চেনেন না? একটা রোগা মেয়ে, শাড়ি পরা, একটু আগে ঝিলের ধার থেকে দৌড়ে এসেছে—!'

দিশা কাছে এসে বলল, 'আপনি কি সুচেতনাকে খুঁজছেন?'

দারোগা মুখ ফিরিয়ে দেখলেন! 'ও আপনি!'

'হ্যাঁ। একটু আগে সুচেতনা আমার কাছে এসেছে। ও খুব অসুস্থ।'

'কোথায় সে?'

'আমার ওখানে!'

'চলুন।'

ওরা প্রায় দৌড়ে এল। দারোগার হাতে রিভলভার। লেতিয়ে পড়ে থাকা সুচেতনাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'এই তো। এই মেয়েছেলেটাই পালিয়ে গিয়েছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে সেপাইরা সুচেতনাকে ঘিরে ধরল। দিশা এগিয়ে গেল দারোগার কাছে, 'শুনুন। এই মেয়েটিকে নিয়ে আপনারা কোথায় যাবেন?'

'কেন? থানায়। আপাতত লকআপে থাকবে। এর পেটে অনেক খবর আছে।'

'কিন্তু সেটা বের করার আগেই ও মারা যেতে পারে। কারণ ও মারাত্মক অ্যাজমা পেশেন্ট। ওর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এখনই অক্সিজেন না দিলে ও বাঁচবে না।'

'মাই গড। অক্সিজেন কোথায় পাব?' দারোগা হতভম্ব।

'আপনি থানায় নিয়ে যাওয়ার পর মারা গেলে, কী লাভ হবে?'

'না। উলটে জবাবদিহি দিতে হবে। কিন্তু ওকে বাঁচানো দরকার। দত্ত, দত্ত।'

'ইয়েস স্যার।' একজন সাব ইনসপেক্টার এগিয়ে এল।

'তুমি দু'জন সেপাইকে নিয়ে সাবডিভিশনাল হসপিটালে যাও। গিয়েই একে ইমার্জেন্সিতে ভরতি করতে বলবে। অক্সিজেন দিতে হবে। কুইক। এই তোলো একে, আমার জিপ নিয়ে যাও। আন্ডারস্ট্যান্ড?' দারোগা হাঁকলেন।

'স্যার, আপনি কি ভ্যানে যাবেন?'

'ওঃ। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। এই মেয়েছেলেটাকে বাঁচাতে পারলে অনেক খবর পাওয়া যাবে।' দারোগা বলতেই জিপ চলে এল বাড়ির সামনে। তাতে তোলা হল সুচেতনাকে। হঠাৎ দারোগা ডাকলেন, 'দত্ত। যদি দ্যাখো রাস্তাতেই মারা গিয়েছে তা হলে—' কানের কাছে মুখ নিয়ে নির্দেশ দিলেন তিনি।

জিপ বেরিয়ে গেল।

এবার দিশার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন দারোগা, 'ইয়েস ডক্টর। আপনি তা হলে এখানে এসে উঠেছেন! শুনেছিলাম, দেখতে আসা হয়নি। তা হলে আর কিছু অজুহাত দেখানোর সুযোগ পাচ্ছেন না!'

'বুঝলাম না।'

'সেই রাত্রে আপনি জেনেশুনেই উগ্রপন্থী ছেলের পা থেকে গুলি বের করেছিলেন! না হলে আজ যখন আমরা ঝিলের ধারে রেইড করি তখন এই মেয়েটা আপনার কাছে এসে আশ্রয় নিত না! ও জানত আপনি ওকে সাহায্য করবেন।'

'এইটা ঠিক বলেছেন। আমি ডাক্তার। যে কোনও অসুস্থ মানুষ এসে দাঁড়ালে আমি তাকে সাহায্য করব প্রাণ বাঁচাতে।' দিশা বলল।

সূর্য এগিয়ে এসে কিছু বলতে যাচ্ছিল, দিশা তাকে ইশারা করল চুপ করতে। দারোগা সূর্যর দিকে তাকালেন, 'এটি কে?'

'ইনি আমার স্বামী, কলকাতায় থাকেন, পেশায় ডাক্তার।'

'কী! হঠাৎ আপনার স্বামী এলে উপস্থিত হলেন সেই সময় যখন আমি রেইড করছি?—

'আমার শাশুড়িও এসেছেন।'

'যাক গে। ওকে, মেয়েটার নাম কী যেন?'

'সুচেতনা।'

'বাব্বা! এদের নামে বেশ কাব্যি থাকে! সুচেতনাকে আপনার কাছে পাওয়া গেল। এ কথা আমার রিপোর্টে থাকবে।' দারোগা হাত নেড়ে ইশারা করল সেপাইদের ফিরে যাওয়ার জন্যে। দিশা হাসল, 'রিপোর্টটা ঠিকঠাক লিখলে খুশি হব।'

'মানে?'

'মানে আপনি খুঁজে পাননি, আমি নিজে আপনার কাছে গিয়ে খবর দিয়েছি সুচেতনা অসুস্থ হয়ে আমার কাছে এসেছে। তাই তো?'

'ওয়েল। তাই।'

'ব্যাস।'

'কিন্তু আপনি খবরটা দিলেন কেন বলুন তো?' দারোগার কপালে ভাঁজ পড়ল,

'ওকে তো অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলতে পারতেন!'

'সেটা আমার কাজ নয় আর তা হলে ও মারা যেত।'

'তার মানে? আপনি ওকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে খবর দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'মাই গড। বেশ বোকা বানালেন তো!'

দারোগা যেন নিজের ওপর রেগে গেলেন। এইসময় একজন পুলিশ এসে জানাল, 'স্যার। মেয়েছেলেরা রাস্তা আটকে দিয়েছে।'

'মানে? কোথাকার মেয়েছেলে?' দারোগা খিঁচিয়ে উঠলেন।

'এই গ্রামের!'

'হোয়াই? কেন?'

'ওরা ভেবেছে ডাক্তারদিদিকে আমরা ধরে নিয়ে যাচ্ছি!'

শোনামাত্র দারোগা দিশার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আপনি এদেরই অর্গানাইজ করেছেন? এখানকার গ্রামে দু'-চারটে চোর থাকে জানতাম কিন্তু মেয়েছেলেরা আন্দোলন করছে এ কথা কেউ কখনও শুনেছে বলে মনে হয় না।'

'দয়া করে মেয়েছেলে শব্দটা ব্যবহার করবেন না। আর আমি কিছুই অর্গানাইজ করিনি। ওরা যে এসেছে তাই আমি জানতাম না।' দিশা বলল।

'বেশ। তা হলে ওদের রাস্তা ক্লিয়ার করতে বলুন।'

দিশা এগিয়ে গেল। বাঁক নিতেই সে অবাক হয়ে গেল। এই আধা-অন্ধকারে অন্তত জনা পঞ্চাশেক মহিলা-শিশু বালিকা বাঁধের মতো রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। সে দু'হাত তুলে চিৎকার করল, 'আপনারা যে যার বাড়িতে ফিরে যান। আমার কিছু হয়নি। আমাকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে না।'

বাঁধটা নড়ে উঠল। দিশা দেখতে পেল দূরে কাছে অনেক ছোট ছোট আলো এদিকে এগিয়ে আসছে। দৃশ্যটি তাকে চমৎকৃত করল। সে দু'হাত জোড় করে অনুরোধ করতে রাস্তা ফাঁকা হল। দারোগা ভ্যানের চালকের সামনে উঠে বসলেন, দিশা সরে এল ভ্যানের পেছনে। আর তখনই তার নজরে পড়ল ভ্যানের ভেতরে চারটে শরীর শুয়ে আছে। নিথর। যাদের মৃগয়া করে ফিরে যাচ্ছে দারোগা তাদের তিনজন কি তার কাছে টাকার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল? ওইসব ওষুধ পাঠিয়েছিল? ওদের কারও সঙ্গে দেখা করতে কি রোজ বিকেলে সুচেতনা ঝিলের ধারে যেত? ওদের কাউকে আহত অবস্থায় ফেলে আসতে বাধ্য হয়ে সে তার কাছে কাকুতি মিনতি করেছিল?

ভ্যান দুটো বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ফুটল। ইতিমধ্যে একশো ছাড়িয়ে

যাওয়া গ্রাম্য মহিলা-বালিকাদের স্বস্তির শব্দ।

ভাঙা গলায় দিশা বলল, 'আপনারা বাড়ি যান মা। আমার কিছু হয়নি।'

সূর্য পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, 'দিশা, আমি তোমার জন্যেই আর এক ভারতবর্ষকে দেখলাম। তোমাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা বলব কী করে!'

ঠিক তখনই অন্ধকার ফুঁড়ে একটি শরীর প্রায় আছড়ে পড়ল দিশার সামনে। কান্না জড়ানো গলায় যা বলল তা বুঝতে হাঁটু গেড়ে বসতে হল দিশাকে। দিশা চিনতে পারল। এই মহিলা বিকেলে এসেছিল। গৌরাঙ্গ একে বলেছিল মেয়েকে শহরে নিয়ে যেতে। এর মেয়ের সন্তান হবে। কোনওরকমে মহিলা বলল, 'দাই বলেছে সে পারবে না। ব্যথা হচ্ছে অল্প কিন্তু বাচ্চা বের হচ্ছে না। মেয়ে মরে যাচ্ছে।'

দিশা উঠে দাঁড়াল। সূর্যের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী করব?'

'হয়তো গলায় নাড়ি জড়িয়ে গেছে। আমি জানি না। ফরসেপে চেষ্টা করতে পারো।'

'ফরসেপ? ফরসেপ কোথায় পাব?' দিশা বিড়বিড় করল।

'তুমি ভুলে যাচ্ছ। তোমার কাছে আসা বাক্সে ফরসেপ আছে। কিন্তু সেটা তো জীবাণুমুক্ত নয়। করতে হবে।'

শোনামাত্র দিশা ছুটল। তার শরীর ঘেমে উঠল। ফরসেপ বের করে একগাদা তুলো, স্যাভলন, কাঁচি একটা বড় প্যাকেটে ভরে নিয়ে দরজার সামনে আসতেই সূর্য বলল, 'আমি কি তোমার সঙ্গে যাব?'

'তুমি? না। কোনও ছেলে ডাক্তারকে ওরা গ্রহণ করেনি। মা, আপনি যাবেন?'

'আমি?'

'আমাকে একটু সাহায্য করবেন?'

'বেশ। চল।'

ভিড় ছাড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে মহিলার সঙ্গে ওরা যেখানে পৌঁছোল সেখানে গিয়ে দিশা অবাক। বাড়িতে নয়, বাড়ির পেছনে উঠোনে একটা চালাঘরের মধ্যে মেয়েটি শুয়ে ছটফট করছে। একটি বুড়ি এগিয়ে এল, 'হবে না, বাচ্চা বেরোবে না।'

'আপনি সরুন।' ধমক দিল দিশা।

তারপর ফরসেপ বের করে স্যাভলনে ভাল করে ধুয়ে নিল।

মেয়েটি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। ওর শরীর থেকে অনেকটা তরল পদার্থ বেরিয়ে এসেছে। দিশা নির্দেশগুলো মনে করার চেষ্টা করল। এর আগে কখনও হাতে কলমে সে এই কাজটি করেনি।

প্রথমত, ইউটেরাসের মুখ সম্পূর্ণ খোলা হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মায়ের শরীরের নীচের দিকে শিশুর মাথা থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, রোটেশন সম্পূর্ণ হওয়া চাই।

সে হাত ঢোকাল। হ্যাঁ, মাথা নীচের দিকেই রয়েছে। শিশুর দুই কান সে আঙুল দিয়ে অনুভব করল। তারপর ফরসেপ ঢুকিয়ে কান এবং রগের ওপর চাপ দিয়ে শিশুকে বাইরে টেনে আনতে চাইল ধীরে ধীরে। মায়ের শরীর যখন শিশুকে বাইরে বেরুতে সাহায্য করছে না তখন যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় তা আবিষ্কার করল দিশা। মাথাটা বেরিয়ে আসতেই শিশুর গলায় জড়িয়ে থাকা নাড়ি দেখতে পেল সে। ইতিমধ্যে সেটা বেশ চেপে বসেছে। দ্রুত নাড়ি খুলে ফেলতেই শিশু বেরিয়ে এল বাইরে।

নিশ্বাস বন্ধ করে কাজ করে যাচ্ছিল দিশা। শিশুকে বের করে আনতেই মনে হল সে বসে পড়বে। শাশুড়ি বললেন, 'এবার তুমি সরো, আমি দেখছি।'

শাশুড়ি শিশুকে নিয়ে পড়লেন। বেশ কয়েকবারের চেষ্টার পর প্রথম শব্দ ফুটল। একটু আস্তে প্রথমবার, তারপর সজোরে। দিশা মেয়েটির দিকে তাকাল। এতক্ষণ প্রায় মৃতের মতো পড়েছিল ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া শরীর নিয়ে। এবার চকিতে তাকাল। শিশুর কান্না শোনামাত্র ওর চোখে মুখে অদ্ভুত আলো ছড়িয়ে পড়ল।

দিশা বলল, 'মা, ওকে ওর মায়ের কাছে দিন।'

শাশুড়ি মেয়েটির পাশে শুইয়ে দিলেন শিশুটিকে। দিশা বুড়ি ধাইকে বলল, 'এবার যা করার তুমি করো। মা চলুন।'

বাইরে বেরিয়ে আসামাত্র মহিলারা এসে দিশার হাত জড়িয়ে ধরল। কেউ কেউ কাঁদছিল। পুরুষরা দূরে কৃতজ্ঞ মুখে দাঁড়িয়ে।

ভেতর থেকে শিশুর কান্না ভেসে আসছে। একটি কান্না যে কতখানি শক্তি এনে দেয় তা এর আগে জানত না দিশা। তার সমস্ত শরীর এখনও রোমাঞ্চিত। এই মুহূর্তে পৃথিবীর কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ তার নেই, কোনও তিক্ততা মনে নেই।

শাশুড়ি ওর কনুই ধরলেন, 'চল, মা।"

আমারবই.কম